যে গবর্ণমেণ্ট কলে কৌশলে আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে একথাও অতি অন্যায়। গবর্ণমেণ্ট বলপূর্ব্বক আমাদের কাছে টাকা লইতেছেন না। আমরা ইচ্ছা করিয়া কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিতেছি, তবে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের দোষ কি? যখন অন্য সম্পত্তির অপেক্ষা কোম্পানির কাগজের জন্য আমাদের এত আগ্রহ, তখন তাহাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে অপরাপর সম্পত্তির অপেক্ষা কোম্পানির কাগজে আমাদের অধিক সুবিধা। যাঁহার সুবিধা বোধ না হইবে তিনি ক্রয় না করিলেই হইল। যখন কেহ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রয় করাইতে পারে না, তখন তিনি কোন্ মুখে গবর্ণমেণ্টের নামে অপবাদ ঘোষণা করিয়া বেড়ান? বস্তুতঃ নগদ টাকা নোট ও কোম্পানির কাগজের প্রকৃতি ভাল রূপে অনুশীলন না করিলে মনুষ্য অতি সহজেই এরূপ ভ্রমে পড়িতে পারে এবং এই জন্যই আমরা এই প্রবন্ধ লিখিলাম। যদি এতদ্দ্বারা পাঠিকা বর্গের কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সফল হইয়াছে।

বঙ্গ-সংসার।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা এই দুইটী সমাজের উন্নতি-পথের প্রধান অবলম্বন। যতদিন আমাদিগের সমাজে এই দুইটীর আদর না হইবে, ততদিন আমরা কোন প্রকারে উন্নতির আশা করিতে পারি না। কেবল সমাজের উন্নতি এরূপ নহে, ইহা হইতে আমাদের সংসারও সুখময় স্থান হইবে। এই দুইটীর অভাবে আমরা সুখে জীবন যাপন করিতে অক্ষম। স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়ে একরূপ শিক্ষিত ও স্বাধীনভাবে চিন্তাশীল হইলে, আমাদের সংসার কি অপূর্ব্ব সুখের স্থান হইত!

অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামী সুশিক্ষিত, স্ত্রী অশিক্ষিত। সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সহবাস কখনই মঙ্গলজনক হয় না। স্বামী যে পথের পথিক হইতে ইচ্ছা করেন, স্ত্রী সে পথের পথিক হইতে ইচ্ছা

করেন না। তিনি স্বামীর সহকারিতা করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে অক্ষম। তিনি স্বামীর মানসিক বৃত্তির অনুসরণ করিতে অক্ষম, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে কি প্রকারে সহানুভূতি প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? স্বামীর যেরূপ আশা, উদ্যম ও উৎসাহ, তাহাতে যদি স্ত্রীও সেইরূপ আশা, উদ্যম ও উৎসাহ লইয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইতে পারেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশ অতিশীঘ্রই উন্নতি লাভ করিবে। নতুবা আমরা কোন প্রকার উন্নতির আশা করিতে পারি না। কেন না, একে আমাদের মনোবল অধিক নয়, তাহাতে যদি প্রতিপদে প্রতিকূলতার সহিত দ্বন্দ্ব করিতে হয়, তাহা হইলে, সেই মনোবল আরও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আমরা যাহা করিব বলিয়া মনে করি, তাহা ঐ প্রকারে সুসাধিত হয় না। অনেক স্থলে উৎসাহশীল যুবক উচ্চ আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দেয়; এবং শোকে ও পরিতাপে চিরকাল জীবনপাত করে।

কেবল ইহাই নয়; আমরা আরও দেখিতেছি, সভ্যদেশে স্ত্রী ও স্বামী যেরূপ বিশুদ্ধ আমোদে নিযুক্ত থাকেন, আমাদের দেশে সেরূপ হয় না। স্বামী স্ত্রীর নিকট হইতে আশানুরূপ আমোদ প্রাপ্ত হন না। স্ত্রী প্রায়ই অশিক্ষিত; অশিক্ষিতের নিকট হইতে সুশিক্ষিত ব্যক্তি কখনই তৃপ্তিকর আলাপ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। সেই জন্য সেই স্বামী সংসারের কার্য্য সমাপন করিয়া বিশ্রাম লাভের জন্য প্রায়ই অন্যত্র গমন করেন। গৃহ তাঁহার পক্ষে শান্তিময় স্থান না হইয়া, বরং অশান্তিকর হইয়া উঠে।

আজকাল শিক্ষার গুণে বঙ্গযুবকের মন উচ্চতর পথে ভ্রমণ করে। কামিনীগণ সুশিক্ষিত হন না; তাঁহারা স্বীয় স্বীয় স্বামীর মনকে কি প্রকারে অনুসরণ করিতে পারিবেন? এই কারণে বঙ্গসংসার সুখের আকর না হইয়া, দুঃখের নিদান হইতেছে। ইহার কারণ অন্বেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, যে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সর্ব্বত্র সমভাবে প্রচারিত না হওয়ায় এই সকল অমঙ্গল উৎপন্ন হইতেছে। এবং যে স্থলে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে স্ত্রী ঐ দুইটীর মর্ম্ম বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন না, সুতরাং আশানুরূপ ফল উৎপন্ন হয় না। এই বিপদে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই সাবধানে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আমাদের

দেশে অনেক দিন ঐ দুইটী রত্নের অভাব। আমরা উহাদের মূল্য কি প্রকারে বুঝিব? এক দিনে বা একেবারে আমরা আশায় সফলতা লাভ করিতে পারি না। সকল বিষয়ই সময় সাপেক্ষ। ক্রমে যখন শিক্ষা ও স্বাধীনতা বঙ্গের সকল গৃহে প্রবেশ করিবে, এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে ইহাদের মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইবেন, তখন আমরা আর এরূপ অমঙ্গলের চিহ্ন দেখিতে পাইব না।

এরূপ মঙ্গলময় ঘটনার সময় অনেক দূরে অবস্থান করিতেছে। সম্প্রতি এ বিপদে আমাদের কিরূপ কার্য্য করা উচিত? যুবকগণ চিত্ত-শান্তির জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিবার পরিবর্ত্তে, যদি আপনাদের মনোভাব ও আশা আপন আপন স্ত্রীর নিকট ব্যক্ত করেন,তাহা হইলে সরল-হৃদয়া কামিনীগণ সাবধান হইবেন ও আপনাদিগকে স্বামীর উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করিবেন সন্দেহ নাই।

এ স্থলে কামিনীগণের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। তাঁহাদের নিশ্চিন্ত থাকা কোন ক্রমে বিধেয় নহে। তাঁহাদের উপর বঙ্গসংসারের ভাবী-মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। বেশভূষার আমোদে মত্ত না হইয়া তাঁহারা যদি আপন আপন কর্ত্তব্য-সাধনে তৎপর হন, তাহা হইলে বঙ্গসমাজ শীঘ্রই উন্নতি-পথে উত্থান করিতে সক্ষম হইবে। কেবল যুবকগণ হইতে আমরা কোন প্রকার আশা করিতে পারি না। স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া, তাঁহারা যদি আপন আপন স্বামীর সহযোগিতা সম্পাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই সকল যুবক অকর্ম্মণ্য না হইয়া কর্ত্তব্যের সুসাধন জন্য কটিবদ্ধ হইবেন।

এতকাল পুরুষগণ, নারীগণের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া কষ্ট পাইতে-ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু বিকসিত হইয়াছে। কামিনীগণের সহযোগিতার ফল বুঝিতে পারিয়াছেন; কামিনীগণের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার জন্য তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া আছেন, এই সময়ে তাঁহারা নিশ্চিন্ত না থাকিয়া যদি পুরুষগণের সহিত যোগ দেন, তাহাহইলে তাঁহারা আপনাদিগের অভিপ্রেত কার্য্যসাধনে তৎপর হইবেন, এবং সকল কার্য্যে আশানুরূপ ফললাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। এই জন্য আমরা বিনীতভাবে আবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা যেন আর পুরুষগণের নিকট

হইতে দূরে থাকিয়া কায না করেন। বরং আশ্বাস-বাক্যে তাঁহাদের দুর্ব্বল মনকে সর্ব্বক্ষণ সবল করিতে চেষ্টা করেন।

পোর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কার।

(১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের ৫৪ পৃষ্ঠার পর)

১৪৯৮ খৃঃ অব্দের ২৪এ ফেব্রুয়ারী তারিখে এই স্থান হইতে পুনরায় জাহাজ ছাড়িল। যাইবার কালে অধ্যক্ষ সেই নদীর নাম "সুলক্ষণা" রাখিয়া গেলেন। পাঁচদিনের পর তাঁহারা দুইটী ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী এক বন্দরে আসিয়া পৌঁছিলেন; ইহা ভূভাগ হইতে প্রায় ২॥০ ক্রোশ। এই স্থানের নাম মোজাম্বিক, ইহা বিপুল বাণিজ্যের আবাসভূমি এবং তৎকালে কুইলোয়া রাজের অধীন ছিল। অতঃপর এইস্থান পূর্ব্ব-আফ্রিকায় পোর্ত্তুগীজ উপনিবেশসমূহের রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

এইস্থানে নৌকারোহণে তত্রত্য অধিবাসিবর্গ জাহাজ দেখিতে আসিল। তাহাদিগের পরিধান উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র, মস্তকে বার্ব্বরীদেশীয়দিগের ন্যায় রেশমী পাগড়ী। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া জাহাজীয়দের মনে আহ্লাদের সঞ্চার হইল, যে তাঁহারা বর্ব্বররাজ্য অতিক্রম করিয়া সুসভ্য জনপদে উপনীত হইয়াছেন। তখন তাঁহাদের মনে উদয় হইল না যে ধর্ম্ম ও জাতি সম্বন্ধীয় বিদ্বেষ রূপ প্রবল শত্রুর সহিত এক্ষণে সংগ্রাম করিতে হইবে। জাহাজের অধ্যক্ষ কে এবং তথায় কি করিতে আসিয়াছেন, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি উত্তর করিলেন তিনি পোর্ত্তুগালেশ্বরের প্রজা, ভারতবর্ষে বিশেষতঃ কলীকট্টে কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা আহারীয় জল এবং দুইজন পথ-প্রদর্শক প্রাপ্তির উদ্দেশে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। যাহার সহিত কথা হইতে ছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ সে ব্যক্তি ফেজ প্রদেশের অধিবাসী; তদ্দেশীয়-দিগের সহিত পোর্ত্তুগীজদিগের বিষম সংগ্রাম চলিতেছিল, সে জন্য

ধর্ম্মবিদ্বেষের উপর আবার পোর্ত্তুগীজদিগের প্রতি তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিল। কথোপকথন কালে যদিও তাহার আকারেঙ্গিতের কথঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল, তথাপি সে ব্যক্তি যথাসাধ্য বন্ধুভাবে আলাপ করিল এবং তাঁহার অভীপ্সিত সমুদায় অভাব পূরণের আশা দিয়া গেল। তৎপরে উভয় জাতির মধ্যে গতিবিধি প্রতিষ্ঠাপিত হইল এবং স্বল্পদিন পরেই তত্রত্য "জেক" অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা জাহাজ দেখিতে আসিলেন। তাঁহার পরিধান উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্ত্র ও মখমলের পরিচ্ছদ, মস্তকে স্বুবর্ণখচিত রেশমী পাগড়ী; এই সাক্ষাৎ উভয় পক্ষে বন্ধুভাবে সম্পন্ন হইল। এতাদৃশ সম্প্রীতির মধ্যেও কতক কতক আশঙ্কার কারণ ছিল। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তিন জন আবিসিনিয়ার অধিবাসী ছিল। ইহারা খৃষ্টানধর্ম্ম হইতে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত! জাহাজের পশ্চাতে স্বর্গীয় দূত গ্যাব্রিয়েলের একখানি প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল; তদ্দর্শনে পূর্ব্বস্মৃতি উদিত হইয়া তাহাদিগকে এতাদৃশ বিচলিত করিল যে বর্ত্তমান ভুলিয়া তাহারা জানু পাতিয়া উহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে তাহাদিগের পূর্ব্বতন ধর্ম্ম বিশ্বাসের পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িলে পোর্ত্তুগীজদিগের মনে স্বতঃই কৌতূহল জন্মিল এবং তাঁহারা ইহাদের সহিত অধিকতর ঘনিষ্টরূপে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। মুরেরা * এই সকল জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে জাহাজ হইতে দূর করিয়া দিল এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের সহিত উহাদের সংস্রব রহিত করিয়া দিল। এইরূপ প্রতিকূল আচরণেও কাষ্ঠ ও জল আহরণের নিমিত্ত গামাকে প্রত্যহ দুই নৌকা লোক কূলে প্রেরণ করিতে হইত। তথায় তিনি স্বল্পমূল্যে এই সকল দ্রব্য পাইতেন। একদা নৌকা গুলি জাহাজ হইতে অধিক দূরে গিয়া পড়িলে সাতখানি বৃহৎ নৌকা আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং বর্শা ও তীর বৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পোর্ত্তুগীজেরা আগ্নেয়াস্ত্রের বলে তাহাদিগকে নিরস্ত ও দূরীভূত করিয়াছিলেন এবং "জেক্ও" এই আচরণ তাঁহার অনুমোদিত নয় বলিয়া প্রকাশ করিলেন। উভয়ের মধ্যে পুনরায় কারবার চলিল, অনেকবার অনেক প্রতিজ্ঞা বন্ধন ও

* আফ্রিকা দেশীয় মুসলমান দিগকে সাধারণতঃ মুর বলিয়া থাকে।

তাহার ভঙ্গ হইল; অবশেষে ভাস্ক তাহাদিগকে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রভাব ও মোজাম্বিককে ভস্মীভূত করিবার ভয় দেখাইয়া আপনার অভিলষিত দ্রব্যাদি ও মোম্বাজায় যাইবার জন্য একজন পথ-প্রদর্শক পাইলেন। তথায় গেলে ভারতবর্ষে যাইবার কার্য্য-কুশল পথ-দর্শক পাইবেন এরূপ আশা ছিল।

মোজাম্বিক সন্নিহিত সেণ্টজর্জ্জ নামক দ্বীপ হইতে গামা ১লা এপ্রিল তারিখে পুনরায় যাত্রা করিলেন এবং আফ্রিকার কূল-সন্নিধান দিয়া যাইতে লাগিলেন। একটী প্রবল স্রোতে তাঁহাকে কুইলোয়া ছাড়াইয়া লইয়া ফেলিল, ইহাতে তিনি বিশেষ দুঃখিত হইলেন কারণ তিনি পথদর্শকের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন, উক্ত স্থান খৃষ্টীয়গণ কর্ত্তৃক অধিকৃত। কিন্তু তাঁহার দুঃখ করিবার কোনও কারণ ছিল না, যেহেতু সে ব্যক্তি মিথ্যা করিয়া তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার জন্য ওরূপ কহিয়াছিল।

কিয়দ্দিনের মধ্যেই পোতপ্রপঞ্চ মোম্বাজায় আসিয়া পৌছিল। এই নগর দ্বীপাকৃতি এক উচ্চ স্থলভাগের উপর গঠিত; ইহার অট্টালিকা সমুদায় প্রস্তর নির্ম্মিত, উহার ছাদ ও বাতায়ন সমূহ পোর্ত্তুগেলের সদৃশ; দূর হইতে এই মনোহর দৃশ্য দেখিয়া নাবিকেরা আনন্দিত হইল, বিশেষতঃ আপন জন্মভূমির সাদৃশ্যহেতু ইহা বিশেষরূপে তাহাদের মনকে আকৃষ্ট করিল। অল্পক্ষণমধ্যে ৪ জন সম্ভ্রান্ত আরোহী লইয়া একখানি নৌকা আসিয়া পৌছিল; ইহারা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া কহিল যে তাঁহাদের আগমনে তাহারাও সেই দেশের রাজা বিশেষ সম্প্রীত হইয়াছেন এবং তথায় তাহারা আপনাদিগের প্রয়োজনানুরূপ তাবৎ বিষয় প্রাপ্ত হইবেন। মোজাম্বিক হইতে আনীত বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শকের সহিত ইহাদের সংস্পর্শ বিশেষরূপে নিবারিত হইল, তথাপি তাহারা ঐ ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে ছাড়িল না। তাহারা স্থলে রাখিবার জন্য পোতাধ্যক্ষকে বার বার অনুনয় করিতে লাগিল, এবং অপর একদল লোক তাহাদের সহিত এই নিমন্ত্রণে যোগ দিল, তথাপি তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, এবং নিজের পরিবর্ত্তে অপর দুইজন নাবিককে চতুর্দ্দিক পরীক্ষা করিবার জন্য স্থলে পাঠাইয়া দিলেন। ইহারা সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া সাতিশয় সম্প্রীত হইল। তথাকার রাজা ইহাদিগকে ধুমধামের

সহিত না হইলেও সাতিশয় অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক সমাদর করিয়াছিলেন। গুজরাটের বণিকবর্গের সহিত তাহাদের দেখা শুনা হইল ; তাহারা আপনাদিগকে খৃষ্টীয়-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিল ; এবং কূলে নামিলে ঐ মতাবলম্বী বহুতর লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে বলিল। এবম্বিধ বহু প্রলোভনে অধ্যক্ষের মন ভিজিল ; তিনি তীরে নামিতে স্বীকৃত হইয়া জাহাজ বন্দরে লাগাইতে অনুমতি দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে জাহাজ তীরের নিকটবর্ত্তী হইবার সময়ে চড়ায় আটকাইবার উপক্রম হইল। এই বিপৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জাহাজ নঙ্গর করা হইল। এই কার্য্য করিবার সময় ইউরোপীয় নাবিকেরা জাহাজের উপরে দৌড়া দৌড়ী ও ভয়ঙ্কর চিৎকার করিয়া থাকে ; এই চীৎকারে ভয়গ্রস্ত হইয়া মূরেরা জাহাজ হইতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তীরে সাঁতরাইয়া উঠিল। এইরূপে তাহাদিগের অন্তঃকরণ মধ্যে যে গূঢ় অভিসন্ধি ছিল, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং গামাও যে আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারিলেন। পরে তিনি পুনরায় পূর্ব্বস্থানে যাইলেন। মূরদিগের বিশ্বাসঘাতকতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ সাবধান হইয়া থাকিতে হইল। তাহারা জাহাজের দড়ী কাটিবার এবং জাহাজ আক্রমণ করিবার বহু চেষ্টা করিয়াছিল। অবশেষে গামা ১৩ জন আরোহী সমেত তাহাদের একখানি নৌকা ধরিয়া ফেলিলেন এবং উহাদিগকে জাহাজে আটক করিয়া রাখিলেন। ইহাদিগের প্রতি তিনি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং ইহাদিগের দ্বারা তিনি মেলিন্দার পথ দেখাইয়া লইয়া ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

লেডি বর্লের দানশীলতা।

মহর্ষি ঈশার এক উপদেশের মধ্যে আছে "যখন তুমি দান কর, তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে, তোমার বামহস্ত তাহা যেন জানিতে না পারে।" বর্ত্তমান সময়ে এই অমূল্য উপদেশের মত কার্য্য আমরা অল্প দেখিতে পাই।

এখন বদান্যতার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় বটে, কিন্তু অনেক স্থলে তাহা নাম বা সুখ্যাতির জন্য। লোকে আমার দানের কথা কিছুই জানিবে না, সংবাদপত্রে আমার প্রশংসাবাদ হইবে না, অথচ যথার্থ দুঃখীদিগের দুঃখ মোচনের জন্য গোপনে গোপনে অর্থব্যয় করিব, এরূপ নিঃস্বার্থ দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অতি অল্প লোকের মতি হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ দান দ্বারাই প্রকৃত পুণ্যলাভ হয়। প্রাচীন কালে আমাদিগের দেশে এবং অন্যান্য দেশেও এইরূপ দানধর্ম্মের অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা এই প্রস্তাবের শিরোদেশে যে মহিলার নাম অঙ্কিত করিয়াছি, তিনিও এইরূপ দানশীলতার আদর্শ।

এই মহিলা ইংলণ্ডরাজ্ঞী এলেজেবেথের প্রধান ধনাধ্যক্ষ লর্ড বর্লের সহধর্ম্মিণী। ইনি যতদিন জীবিত ছিলেন, নানাবিধ সৎকার্য্যে তাঁহার অর্থের সার্থকতা সাধন করিয়া ছিলেন, কিন্তু এরূপ সঙ্গোপনে সেই কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেন, যে তাঁহার স্বামী পর্য্যন্ত তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারেন নাই। ইহাঁর মৃত্যুর পর সেই সকল কার্য্য প্রকাশিত হইলে স্বামী যারপর নাই আশ্চর্য্য হইয়া রমণীর গুণাবলী আলোচনা পূর্ব্বক আপনার শোকার্ত্ত হৃদয়কে সান্ত্বনা করিতেন। তাঁহার জীবৎকালে তিনি পতির সহিত দয়া সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন করিতেন এবং বিদ্যার্থিদিগকে সাহায্য দান, দরিদ্রদিগের অভাব মোচন প্রভৃতি অতিশয় সুখকর কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, কিন্তু তাহাতে স্বামী এইমাত্র বুঝিতেন যে এইসকল সৎকার্য্যে তাঁহার ইচ্ছা ও অনুরাগ আছে, তিনি যে বস্তুতঃ সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিতেছেন, স্বামী তাহা অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেন না।

লেডী বর্লের সহিত অনেক বিদ্যালয় ও ধর্ম্মমন্দিরের অধ্যক্ষদিগের বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল, তিনি উহাঁদিগের হস্ত দিয়া আপনার অন্তরের শুভ ইচ্ছা সাধন করিতেন এবং তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুত করিতেন যে তিনি যতদিন জীবিত আছেন, তাঁহার দানের কোন কথা তাঁহারা অপরের নিকট ব্যক্ত করিবেন না। কেম্ব্রিজের সেণ্টজন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদ্বারা তিনি তত্রত্য দুইটী ছাত্রের ভরণপোষণ ও শিক্ষার উপযোগী স্থায়ী বৃত্তি স্থাপন

করেন। ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের ধর্ম্মাধ্যক্ষের নামে কিছু ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া তাহার আয়দ্বারা এই বৃত্তির সংস্থান করিয়া দেন। পল ও ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের ধর্ম্মযাজক এবং আডার্লী নামক আর একটী ভদ্রলোকের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া লণ্ডনের শ্রমজীবীদিগের জীবিকার জন্য একটী বিশেষ উপায় করেন। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা কর্ম্মকার, সূত্রধার, তন্তুবায় বা তদ্রূপ কোন ব্যবসায় অবলম্বনে ইচ্ছুক হইত, তিনি দুই বৎসর অন্তর তদ্রূপ ৬ ব্যক্তির প্রত্যেককে ২০০ টাকা করিয়া ধার দিয়া সাহায্য করিতেন। চেষ্টনট ও উথামে আর ছয় ব্যক্তিকে প্রায় ১৫০ টাকা করিয়া দিয়া সাহায্য করিতেন। প্রত্যেক মাসের প্রথম রবিবার চেষ্টনটে ২০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতেন। সেণ্ট জন কলেজের প্রচারকেরা তিন মাস অন্তর এক একটী বিশেষ ধর্ম্মোপদেশ দিবেন, এজন্য বার্ষিক প্রায় ৫০ টাকা প্রদান করিতেন। তাঁহার এইরূপ সদনুষ্ঠান যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, চলিয়াছিল।

বৎসরের মধ্যে চারিবার তিনি লণ্ডনস্থ দরিদ্রদিগের ভোজের জন্য অর্থ দান করিতেন, তদ্দ্বারা প্রায় ৪০০ ব্যক্তির পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন হইত। মধ্যে মধ্যে তিনি লণ্ডন ও চেষ্টনটের দরিদ্রদিগের জন্য পরিধেয় বস্ত্র ও জামা বিতরণ করিতেন।

সেণ্ট জন কলেজের হলে অনেক সময় আগুন থাকিত না, এজন্য ছাত্রদিগের ক্লেশ হইত, তিনি তথায় সকল সময় অগ্নি রক্ষার জন্য কয়লা ক্রয়ের টাকা পাঠাইয়া দিতেন।

কেম্ব্রিজের সাধারণ বিদ্যালয়সকলে যাইবার জন্য একটী পথ ও গৃহ নির্ম্মাণ হয়, তিনি আপনা হইতে তাহার ব্যয় পূরণ করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ অব্ সেণ্ট জন্স, অক্সফোর্ডের ক্রাইষ্ট চর্চ, সেণ্ট জন্স কলেজ এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টার কলেজের পুস্তকালয়ে তিনি অনেক মূল্যবান পুস্তক প্রদান করিয়া উক্ত পুস্তকালয় সকলের উন্নতি সাধন করেন।

চেষ্টনট পল্লীর গরিব স্ত্রীলোকদিগের উপকারার্থ তিনি প্রতিবৎসর তাহাদিগকে পশম ও পাট বিতরণ করিতেন, তদ্দ্বারা তাহারা যে কাজ করিত তাহা দর্শন করিতেন। অনেক স্থলে তাহাদিগের প্রস্তুত বস্ত্রাদি

ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া দুঃখীদিগকে বিতরণ করিতেন।

তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে প্রভূত পরিমাণে গম ও সর্ষপ ক্রয় করিয়াছিলেন, ইহাদ্বারা আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষে দরিদ্রদিগের সাহায্য করিবেন এই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার মৃত্যুসময়ে ইহা ভাণ্ডারজাত ছিল, তাঁহার স্বামী পশ্চাৎ তাহা দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

অদ্ভুত শিল্প-নৈপুণ্য।

সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যে এ দেশের শিল্পীদিগের সুখ্যাতি আছে। পারস্যের এক রাজদূত ঢাকাই কাপড়ের এক পাগড়ী আপনার রাজার জন্য উপহার লইয়া যান, ইহা রত্নমণ্ডিত একটী নারিকেলের খোলের মধ্যে ছিল; দৈর্ঘে ৩০ গজ, কিন্তু এরূপ সূক্ষ্ম যে স্পর্শদ্বারা কিছুমাত্র বোধগম্য হয় নাই। কার্পাসের ন্যায় এ দেশে রেশমেরও অতি সূক্ষ্ম কাজ হইত। অরম নামক ভ্রমণকারী বঙ্গদেশের রেশম সূত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন "এ দেশীয় স্ত্রীলোকেরা গুটী হইতে রেশমের সূতা বাহির করে। একটী গুটী হইতে স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে ২০ প্রকার সূত্র উৎপন্ন হয়। এই স্ত্রীলোকদিগের স্পর্শশক্তি এরূপ আশ্চর্য্য যে অঙ্গুলি দিয়া সূতা এত দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে যে চক্ষে দেখা যায় না, অথচ এই সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলিস্পর্শে বিভিন্ন প্রকারের সূতা পৃথক্ পৃথক্ সংগৃহীত হইতেছে। রেশমের পরিপাটী বস্ত্র এবং কাশ্মীরী সূক্ষ্ম শিল্পজাত শাল ভারতবাসীদিগের আশ্চর্য্য শিল্প-নৈপুণ্যের অদ্যাপি সাক্ষ্য দান করিতেছে। ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে গহনা এবং ধাতু ও কাষ্ঠময় দ্রব্যের আশ্চর্য্য সূক্ষ্মকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, উৎসাহদানের অভাবে এ দেশীয়দিগের প্রতিভা খুলিতে পারিতেছে না।

যাহা হউক সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণ বিষয়ে ইউরোপীয় শিল্পকারদিগের ক্ষমতার প্রশংসা করিতে হয়। প্লিনী এবং ইলিয়ান লিখিয়াছেন মার্ম্মিসাইডেরা হস্তিদন্তে চারিচাকা ওয়ালা চারিঘোড়ার গাড়ী এবং মাস্তল রজ্জু প্রভৃতি সহিত

জাহাজ এরূপ সূক্ষ্মরূপে প্রস্তুত করিয়াছিল যে একটী মৌমাছির দুই পাথায় তাহার সমুদায় ঢাকিয়া যাইত। রাজ্ঞী এলিজেবেথের রাজত্বের ২০ বর্ষে মার্ক স্কেলিয়ট নামক এক জন ইংরাজ কর্ম্মকার লৌহ, ইস্পাত ও পিত্তলের একটী চমৎকার কুলুপ তৈয়ার করে, তাহা ১১ খানি স্বতন্ত্র ধাতুখণ্ডে গঠিত, কিন্তু চাবি সহিত ওজনে ১ ধান মাত্র। এই শিল্পী ৪৩টী শিকলী দিয়া এক ছড়া সোণার চেইন তৈয়ার করে, উক্ত কুলুপ চাবির সহিত এই চেইন এক মাছির গলায় বাঁধিয়া দিলে সে অনায়াসে ইহা টানিয়া লইয়া যায়। চেইন, কুলুপ, চাবি ও মাছি মোটে ওজনে ১৷৹ ধান মাত্র।

হেড্রিয়েনস্ জুনিয়স মেকলিন নগরে একটী আশ্চর্য্য ক্ষুদ্র ঝুড়ী দেখেন। চেরি ফলের বীচি হইতে শাঁস বাহির করিয়া ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল। এই ঝুড়ীর মধ্যে চৌদ্দ যোড়া পাশা দৃষ্ট হয়। পরিষ্কার চক্ষে প্রত্যেক পাশা ও তাহার দাগগুলি স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

পোপ পঞ্চম পলের সময়ে মিটেল ব্রাচের সাড নামক এক ব্যক্তি এক অত্যাদ্ভুত শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। একটী গোল মরিচের খোলের মধ্যে ১৬০০ খানি ডিস বা পাত্র রক্ষিত হইয়াছিল। এই পাত্রগুলি এত সূক্ষ্ম যে চক্ষে দেখা যায় না, পোপ চসমা চক্ষে দিয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তিনি নিকটস্থ আরও কয়েক ব্যক্তিকেও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলেন। তাহারা সকলেই স্বচক্ষে দেখিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করে।

টুরিয়ান নামক এক শিল্পকার এত ক্ষুদ্রাকার লৌহার জাঁতা তৈয়ার করিয়াছিলেন যে তাহা দস্তানার ভিতর লইয়া যাওয়া যাইত, কিন্তু তাহার জোর এত অধিক যে এক দিনে ৮ জন লোকের আহারোপযোগী শস্য গুঁড়া করিত।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বর ৩য় জর্জের জন্মদিনে আর্ণোল্ড নামক লণ্ডনের এক শিল্পী এক আশ্চর্য্য ঘড়ী প্রস্তুত করিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। ঘড়ীটী আকারে দু আনির অপেক্ষাও অনেক ক্ষুদ্র, তাহার মধ্যে ১২০টী ভাগ স্পষ্টরূপে অঙ্কিত, ওজনে আধ কাঁচ্চা মাত্র। ইহা দেখিয়া রাজা ও রাজপরিবারস্থ সকলে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হন।

অল্প স্থানের মধ্যে সূক্ষ্মলিপি সম্পাদন বিষয়ে অনেক ব্যক্তি আশ্চর্য্য

নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। এলিজেবেথের রাজত্বকালে এক ব্যক্তি একটী ডবল পয়সার মধ্যে দশ আজ্ঞা, ধর্ম্মমত, পেটার নষ্টর, রাজ্ঞীর নাম এবং খ্রীষ্টাব্দ প্রভৃতি লেখেন, এক যোড়া চসমার সাহায্যে রাজ্ঞী প্রত্যেক অক্ষর স্পষ্টরূপে পাঠ করেন। লণ্ডনের ডেবিস নামক একজন খোদকার অর্দ্ধ ফু-আনির (রৌপ্য পেনি) মধ্যে প্রায় ঐ সমস্ত লেখা সম্পন্ন করেন। লিবারপুল-নিবাসী এক শিল্পকার দীর্ঘে প্রস্থে ৩ বুরুল স্থানের মধ্যে গোল্ডস্মিথের 'ট্রাবেলার' নামক কাব্য অর্থাৎ ৪৮৮ পংক্তি পদ্য লেখেন, এইরূপ অন্যান্য কাব্যও সূক্ষ্ম লিপিতে লিখিত হইয়াছে। ফ্রাঙ্কো প্রসিয়ান যুদ্ধে ফরাসিরা পায়রার গলায় চিঠি বাঁধিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ করিত। এই চিঠি এরূপ সূক্ষ্ম অক্ষরে লিখিত হইত যে খোলা চক্ষে কিছুই দেখা যাইত না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহা পাঠ করা যাইত।

দেশ ভ্রমণ।

কাঁথী।

আমরা কলিকাতা হইতে কোন কার্য্যোপলক্ষে হিজলী-কাঁথী অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। এই স্থান বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত এবং এক সময় লবণ-পোক্তানের জন্য অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। বঙ্গদেশের এক প্রধান বানিজ্য দ্রব্য যে লবণ ছিল, তাহা এই অঞ্চলে উৎপন্ন হইত। সমুদ্রের জল লবণাক্ত, তাহা হইতে অতি সহজ কৌশলে ইহা প্রস্তুত হইত। দেশবাসী নিম্নশ্রেণীর সহস্র সহস্র লোক * এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রতিপালিত হইত এবং ইহার দেওয়ানী প্রভৃতি কার্য্য করিয়া দেশস্থ অনেক ভদ্রলোক † প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এ দেশে বিলাতী লবণের আমদানী হওয়া অবধি দেশীয় লবণ উৎপাদন রীতি রহিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেকের জীবিকার পথ লোপ পাইয়াছে।

---

* যাহারা লবণ প্রস্তুত করিত, তাহারা মলঙ্গী নামে উক্ত হইত। † সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর নেমক মহলের দেওয়ান ছিলেন।

লবণ পোক্তানের জন্য নেমক মহলে যে লোক সমাগম, কারখানার ব্যস্ততা এবং সাহেব ও দেশীয় ভদ্রলোকদিগের উপার্জন ও কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত ছিল, তাহা রুদ্ধ হইয়াছে—স্থানে স্থানে কেবল এক একটী পরিত্যক্ত অট্টালিকা বা ভগ্ন ইষ্টকরাশি গত ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

কাঁথী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। মেদিনীপুরে ঘাটাল, তমলুক এবং কাঁথী এই তিনটী সবডিবিসন বা উপবিভাগ আছে। কলিকাতা হইতে মেদিনীপুরে ষ্টিমারযোগে যাইবার সুবিধা আছে। প্রথমে কলিকাতা হইতে উলুবেড়েতে যাইতে হয়, তথা হইতে নূতন কেনাল বা খাল দিয়া দুই দিনের মধ্যে মেদিনীপুরে উপস্থিত হইতে পারা যায়। কিন্তু কাঁথী যাইবার এ পথ নয়। উলুবেড়ের আরও অনেক দক্ষিণে 'গেঙ্গোখালী' নামক একটী স্থান আছে, তথায় রূপনারায়ণ নদ ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই পথ দিয়া কাঁথী যাইতে হয়। কলিকাতা হইতে গেঙ্গোখালী পর্য্যন্ত একটী ষ্টিমার প্রত্যেক সোম, বুধ ও শুক্রবার যায় এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া থাকে। আমরা ২০এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার ৯টার সময় ষ্টিমারে যাত্রা করিলাম, পথে বাঁউড়ের কল, বজবজের ছাউনি এবং উলুবেড়ে দর্শন করিলাম। ইহার নিকটে দামোদর নদ ভাগীরথীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। উলুবেড়ে পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতেই গঙ্গার জল লবণে ভরা, আর মুখে দেওয়া যায় না। বেলা ৫।।০টার সময় আমরা গেঙ্গোখালীতে পৌছিলাম। এখানে দক্ষিণদিকে ভাগীরথী প্রবাহিত, পশ্চিমে রূপনারায়ণ অসীম বিস্তারিত হইয়া রহিয়াছে। ষ্টিমার নদীর উপরে রহিল, জালীবোটে করিয়া আমাদিগকে কিনারায় নামিতে হইল।

গেঙ্গোখালী একটী অতি সামান্য স্থান। তথায় একটী বাজার আছে কতকগুলি বিদেশী ব্যবসাদার পুরুষ এবং স্ত্রীলোক আছে। তাহাদিগের অনেকের আচার ব্যবহার এবং চরিত্র দেখিয়া বড় ভাল বোধ হয় না। কলিকাতা হইতে গেঙ্গোখালী ২০।২২ ক্রোশ মাত্র। কিন্তু এই স্থান হইতে মনুষ্যের চেহারা ও ভাষার পরিবর্ত্তন স্পষ্ট অনুভূত হয়। বাঙ্গালী ক্রমে উড়ের রূপ ধরিতেছে এবং বাঙ্গালা ভাষা ক্রমে উড়িয়াত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। গেঙ্গোখালীতে বিদেশীয়ের বাস করা যেরূপ শঙ্কাজনক, এখানে

সুবিধা মতে নৌকাদি প্রাপ্তিরও সেইরূপ অসুবিধা। আমাদিগকে গেঙ্গোখালী হইতে কাটা খাল দিয়া কাঁথী অভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে অধিক ভাড়া স্বীকার করিয়াও নৌকার যোগাড় করিতে পারিলাম না। তথায় একটী নৌকার ঘাট আছে, কিন্তু তাহাতে অধিকাংশ ধান্য চাউল প্রভৃতির ভারী নৌকা আসিয়া থাকে, ভাউলে বা পান্‌সী প্রভৃতি পাইবার আদৌ সুবিধা নাই। সৌভাগ্যক্রমে ঘাটের দারোগা অতি সদাশয় লোক, তিনি আমাদিগের অবস্থা দেখিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া একজন মাজি ঠিক্ করিয়া দিলেন। প্রথমে এক খোলা নৌকায় আমাদিগকে মহিষাদল পর্য্যন্ত আসিতে হইল, তথা হইতে ছৈওয়ালা এক নৌকা পাইলাম এবং তদ্দ্বারা কাঁথীর অনতি-দূরবর্ত্তী কালীনগর পর্য্যন্ত গমন করিলাম। গেঁওখালী হইতে খালকাটা হইয়া কাঁথীতে আসিবার অনেক সুবিধা হইয়াছে। কালীনগর কাঁথী হইতে ৫ ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী, ইহার মধ্যে রাস্তা পথ আছে। খাল কাঁথী পর্য্যন্ত কাটা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে সকল সময়ে নৌকা গমনাগমনের সুবিধা হয় না। কালীনগর হইতে বালেশ্বর পর্য্যন্তও একটী খাল কাটা হইতেছে। ইহা সম্পূর্ণ হইলে কলিকাতা হইতে বালেশ্বর পর্য্যন্ত এককালে জলপথে যাওয়া যাইবে। জগন্নাথ ক্ষেত্রের যাত্রীরা এই কাঁথীর পথ দিয়াই পুরীতে যায়, তাহাদিগের পথের এখনও এত ক্লেশ রহিয়াছে যে দেখিলে অত্যন্ত দুঃখ হয়।

গেঁওখালী হইতে কালীনগরে যে কেনাল গিয়াছে, তাহার জল মেদিনী-পুরের খালের ন্যায় মিঠা নহে, সুতরাং তাহাদ্বারা কৃষিকার্য্যের কোন উপ-কারের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু জলপথে গমনাগমন ও বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে। এই খালের মধ্যে মধ্যে কবাটী কল আছে, তাহাদ্বারা স্থানে স্থানে জলের অনাটন হইলে তাহা দূর করা হয়। কালীনগরে যাইবার পূর্ব্বে কালী বা হল্‌দী নামে একটী নদী পার হইতে হয়, ইহার জল প্রায় সর্ব্বদা হরিদ্রা বর্ণ দেখায়। এই নদী অতি প্রশস্ত এবং ইহাতে প্রায় সর্ব্বদাই তুফান উপস্থিত হয়, এ জন্য অতি সাবধানে ইহা পার হইতে হয়। খালে নৌকা চালাইতে কোন ভয় নাই, একটী বালকও ইহা চালাইয়া

লইয়া যাইতে পারে এবং দাঁড়ীরা প্রায় দাঁড় না বাহিয়া গুণ টানিয়া লইয়া যায়। বায়ু অনুকূল হইলে পাল তুলিয়া দিয়া কেবল হালটী ধরিয়া থাকিলেই হয়, আর কিছুই করিতে হয় না। কিন্তু পাল তুলিয়া এই হল্‌দী নদী পার হইতে বুক কাঁপিতে থাকে। এই খালপথে মহিষাদল ভিন্ন আর কোথাও খাদ্যাদি পাইবার যো নাই। শুমো চিড়া, পচা নারিকেল, দুর্গন্ধ দধি, কোতরা গুড় বা বাতাসা সুখাদ্যের মধ্যে ইহাই দুই এক স্থানে পাওয়া যায়। হুড়ুম নামে এক প্রকার চাউল ভাজাও পাওয়া যায়। পূর্ব্ব হইতে রন্ধনের উপকরণ বা খাদ্যাদি সঙ্গে না লইলে প্রায় উপবাস-ব্রত পালন করিতে হয়। এ অঞ্চলের সুলভ দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ ও মৎস্য, কিন্তু হাটের দিন ভিন্ন তাহা পাইবার বড় সুবিধা নাই, সুতরাং পথিক লোকের পক্ষে তাহা পাওয়া দুর্ঘট। গেঁঙ্গোখালী হইতে কালীনগর প্রায় ১২ ক্রোশ, আমরা মধ্যে মধ্যে অনুকূল বায়ু পাওয়াতে ২০ ঘণ্টায় উত্তীর্ণ হইলাম, নতুবা আরও ১০।১২ ঘণ্টা বিলম্ব হইতে পারিত।

কালীনগর হইতে কাঁথী পাঁচ ক্রোশ পথ, ইহার মধ্যে কাঁচা রাস্তা। আমাদিগের যাইবার জন্য এক টমটম গাড়ী ছিল, কিন্তু বৃষ্টি হইয়া রাস্তা এমনি কর্দ্দমময় হইয়াছিল যে গাড়ী টানিয়া লওয়া ভার, চাকার প্রতি আবর্ত্তনে ১মণ, ২মণ মাটী তাহার গায় সংলগ্ন হইয়া চলিল। এজন্য গাড়ীকে বিরাম দিয়া অনেক পথ পদব্রজে যাওয়াই আমরা শ্রেয়স্কর বোধ করিলাম।

বৃহস্পতিবার ঠিক্ সন্ধ্যার সময় আমরা কাঁথীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পথে আসিতে আসিতে জলবায়ু এবং দেশের প্রকৃতি যেরূপ অনুভূত হইতেছিল তাহা বড় উপাদেয় নহে, কিন্তু কাঁথীতে পৌছিয়া তাহার বিপরীত বোধ হইল। ইহার কারণ আছে। কাঁথী হিজলী অঞ্চলের মরুদ্বীপ স্বরূপ। এ স্থানটী সমুদ্র হইতে ২॥ ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী হইলেও বালুগিরির উপর সংস্থাপিত। বালুকাময় পাহাড়ের মালা ইহার চারিদিকে, তদুপরি বিবিধ বৃক্ষও উৎপন্ন হইয়াছে। বৃষ্টি হইলে ইহা ধুইয়া অতি সুন্দর হয়। অন্য সময়ে বালুকা সকল রাশীকৃত হইয়া এমনি থাকে যে পথে চলিতে তাহাতে পা ডুবিয়া যায়, কিন্তু বর্ষাকালে বালুকাময় পথ

অতি সুদৃশ্য ও সুখগম্য হয়। এখানে গভীর কূপ খনিত হইয়া থাকে এবং পুষ্করিণীর জল অপেক্ষা তাহার জল পরিষ্কৃত, সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যজনক। এই সকল কারণে চারিদিকের জলাভূমির মধ্যে কাঁথি স্বাস্থ্যপ্রধান স্থান হইয়া আছে, ম্যালেরিয়া বা কোন সংক্রামক রোগ এখানে কখন দেখা দেয় নাই।

কাঁথীর প্রধান শোভা ইহার বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেটী কুঠী। ইহা এক সময় লবণ-পোক্তানের রাজপাঠ ছিল এবং অনেক সাহেব এখানে অধিষ্ঠান করিয়া রাজত্ব করিয়াছেন। এই কুঠী একটী বৃহৎ অট্টালিকা, উচ্চ বালুগিরির উপরে সংস্থাপিত, অনেক অর্থব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং চৌরঙ্গীর একটী উৎকৃষ্ট প্রাসাদের সহিত ইহার তুলনা করা যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আশ্বিনে ঝড়ে ইহার স্থানের স্থানের বারাণ্ডা ভগ্ন হওয়াতে ইহাকে সময় সময় ঝড় বৃষ্টির উৎপাত সহ্য করিতে হয়। অট্টালিকার চারি ধারে প্রশস্ত প্রান্তর, ঝাউ বৃক্ষ দ্বারা শোভিত, দুই প্রান্তে মেওয়া বৃক্ষের বাগানের ভগ্নাবশেষ আছে। এই প্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে মুন্সেফী কাছারী, খাসমহলী কাছারী, ইঞ্জিনিয়ারের আফিস, পুলিস, পোষ্ট আফিস প্রভৃতি সরকারী প্রায় সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কাঁথী একটী ক্ষুদ্র উপনগর, তত্রত্য অধিকাংশ লোকই প্রবাসী, কর্ম্মোপলক্ষে এখানে বাস করিয়া থাকেন। সরকারী কর্ম্মচারী এখানে অনেকগুলি আছেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এখানকার প্রধান রাজকর্ম্মচারী। বরাবর সাহেব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এখানে ছিলেন, সম্প্রতি তৎপদে বাঙ্গালীকে অভিষিক্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে সাহেব আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারও ছিলেন, তৎপরিবর্ত্তে এক্ষণে বাঙ্গালী আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইয়াছেন। এখানে মুন্সেফ ৩ জন আছেন। খাসমহলের প্রজাদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের মকর্দ্দমা উপস্থিত হওয়াতে একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সবডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর, খাসমহলের ম্যানেজার, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইনস্পেক্টর প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম্মচারী এবং কয়েকটী কৃতবিদ্য উকীলও আছেন। কাঁথী ক্ষুদ্র স্থান হইলেও

অনেকগুলি ভদ্রলোকের সমাগমে ইহা অতি সুন্দর বাসযোগ্য স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

কাঁথী-প্রবাসী সরকারী ও ভদ্রলোকদিগের যত্নে এখানে একটী উচ্চ-শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এখানে ব্রাহ্মসমাজও আছে, দুইটী ভদ্রলোকের বাটীতে সপ্তাহে দুই দিবস নিয়মিতরূপে ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। ব্যায়াম প্রদর্শক যুবকদল, যাহারা নাটকদলের মত দেশ-ভ্রমণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, আমরা দেখিলাম, তাহাদিগের এক দলও কাঁথীতে উপস্থিত। এক রজনীতে ব্যায়াম প্রদর্শন হয়, দূর স্থান হইতেও লোক সকল উৎসাহ সহকারে ইহা দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছিল।

কাঁথী হইতে ২॥ ক্রোশ দূরে জনপুট নামক স্থানে গমন করিলে সমুদ্র বা বঙ্গোপসাগর দর্শন করা যায়। রাত্রিকালের গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে এই সমুদ্রের হু হু শব্দ কাঁথী হইতে বেশ শুনা যায় এবং মাজেষ্ট্রেটের কুঠীর ছাদ হইতে ইহার তীরবর্ত্তী বাঁদ দেখিতে পাওয়া যায়। কাঁথী হইতে জনপুটে যাইবার পথ অতি সঙ্কীর্ণ ও কর্দ্দমময়, না গাড়ী যোগে না পদব্রজে তথায় যাইবার সুবিধা দেখা যায়।

আমরা একটী হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তথায় গমন করিলাম। কাঁথীর আশপাশের লোকদিগের আকৃতি প্রায় উড়িয়া, ভাষা উড়িয়া মিশ্রিত বাঙ্গালা, যখন তাহারা আপনা আপনি কথাবার্ত্তা বলে ঠিক্ উড়িয়া বলিয়া বোধ হয়। জনপুটের পথে ইহাদের আলাপাদি শুনিতে শুনিতে আমরা আমোদে যাইতে লাগিলাম। জনপুটের বাঁধের নিকট একটী পাকা বাঙ্গালা আছে, তথায় বিশ্রামাদি করিতে পারা যায়। আমরা বাঁধ পার হইয়া তিন দিকে কুল কিনারা নাই সমুদ্র দর্শন করিলাম। প্রথমে প্রসারিত বালুভূমি, তৎপরে জল অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইতেছে। জল ঘোলাটে, তরঙ্গ সকল উচ্চশৃঙ্গ হইয়া তীরে আসিয়া পড়িতেছে। আমরা জলের উপর দিয়া প্রায় অর্দ্ধপোয়া পথ গমন করিলাম, তাহাতে এক কোমর মাত্র জল হইল। তরঙ্গমালা একের পর আর ক্রমাগত উত্থিত হইয়া শরীর ভাসাইয়া তুলিতে এবং মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। ঢেউ খাইতে এবং তরঙ্গে ভাসিতে

খুব আনন্দ হইল, কিন্তু অল্পক্ষণ লোণাজলে চক্ষু মুখ জলিতে থাকে এবং একটু জল গলাধঃকরণ হইলে বমনের উদ্রেক হয়। সমুদ্রে স্নান করিয়া অপর জলে গাত্র ধৌত করিতে হইল। জনপুট হইতে গঙ্গাসাগরের দ্বীপ অতি নিকটে; তত্রত্য লাইটহাউস এ স্থান হইতে দৃষ্টিগোচর হয়।

(ক্রমশঃ)

বর্ণ।

এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের অনুপম সৌন্দর্য্য বাহুল্যরূপে বর্ণ-বৈচিত্রের উপর নির্ভর করে। যদি সকল পদার্থ একবর্ণের হইত, তাহা হইলে এ সৌন্দর্য্যের কিছুই থাকিত না। নিরন্তর একরূপ বর্ণ দেখিতে দেখিতে শীঘ্রই নয়ন মন ক্লান্ত হইয়া পড়িত। বিশাল সমুদ্র, বিপুল মরুভূমি, কেন্দ্রপ্রদেশের তুষার রাশি ইত্যাদি দৃশ্য বর্ণ-বৈচিত্রের অভাবেই ভয়ঙ্কর ও নয়নের পক্ষে ক্লেশকর প্রতীয়মান হয়। আর সন্ধ্যাগগনের বিচিত্র মেঘচ্ছটা, বায়ু-হিল্লোলে তরঙ্গায়িত শস্য-ক্ষেত্রের শ্যামল শোভা, সুরম্য উদ্যানের বিচিত্র রূপ, কুসুমদলের মৃদু মাধুর্য্য, ময়ূরপুচ্ছের সৌন্দর্য্যবিভা এবং সর্ব্বোপরি মনুষ্য মুখের স্বর্গীয় শ্রী এই সকল বর্ণ-বৈচিত্র হেতু অপরূপ শোভায় বিভূষিত দেখায়। এই বর্ণ কি? ইহার তত্ত্ব জানিতে সকলেরই স্বতঃ কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। আমরা এই প্রস্তাবে সংক্ষেপে এবং সরল ভাবে ইহার স্থূল বিষয় গুলি প্রকাশ করিব।

বর্ণজ্ঞানলাভের জন্ত তিনটী বিষয়ের প্রয়োজন ঃ—১ম, আলোক; ২য় পদার্থ; ৩য় চক্ষু। বর্ণজ্ঞানলাভের জন্য এই তিনটিরই সত্তা অবশ্য প্রয়োজন; ইহার মধ্যে একের অভাবে কোনও মতে বর্ণের উপলব্ধি সম্ভবপর নহে। চক্ষু আছে, পদার্থ আছে, কিন্তু আলোক নাই, তুমি কি দেখিবে? সকলই ঘোর অন্ধকার! কোন বস্তু, যে বর্ণের হউক না কেন, তোমার নয়ন পথে পতিত হইবেনা। আবার আলোক আছে, চক্ষু আছে, পদার্থ নাই কি দেখিবে? সকলই শূন্য! আলোক আছে, পদার্থ আছে, কিন্তু চক্ষু নাই; সে অবস্থাতেও বর্ণজ্ঞানলাভ অসম্ভব। এই তিনটীরই

প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু দৃষ্টি ও বর্ণজ্ঞান বিষয়ে আলোকের যত প্রয়োজন, অন্য কিছুরই তত নহে, সে জন্য আলোককে দৃষ্টি ও বর্ণজ্ঞানের মুখ্য কারণ বলা যাইতে পারে।

কতকগুলি পদার্থ স্বতঃ আলোকময়, এবং অপর কতকগুলি প্রতিফলিত আলোকে আলোকময়। সূর্য্য, নক্ষত্র, অগ্নিশিখা প্রভৃতি স্বতঃ আলোকময়, ইহাদিগকে দেখাইবার জন্য অন্য আলোকের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু চন্দ্র সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হওয়াতেই মনুষ্য চক্ষুর গোচর হয়। গৃহদ্বার, পশু, পক্ষী, মানব প্রভৃতি পদার্থ ও জীবের মধ্য হইতে কোন আলোক বহির্গত হয় না; অন্য আলোক ইহাদের উপর পড়িয়া প্রতিফলিত হওয়াতেই ইহারা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এ জন্যও আলোককে দর্শনের মুখ্য কারণ বলা যায়।

আলোক নানাবর্ণের; রক্ত, হরিত, পীত ইত্যাদি। সূর্য্যালোক শ্বেতবর্ণ; বিবাহ এবং পর্ব্বের সময় দীপক জ্বালিয়া নানাবর্ণের আলোক দেখান যায়; গন্ধক জ্বালিলে নীলবর্ণের আলোক উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে আলোক কি? এবং এই সকল নানাবর্ণের আলোক কিরূপে উৎপন্ন হয়?

আলোক কি? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা সহজ নহে, এবং একাল পর্য্যন্ত ইহার স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া "ইথার" নামে এক অতি সূক্ষ্ম, স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট পদার্থ আছে। ইহার কম্পনেই আলোকের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বামাবোধিনীর পাঠিকাবর্গ ইতিপূর্ব্বে শব্দের উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিষয়ে কতক কতক অবগত হইয়াছেন। বায়ুর কম্পনে শব্দের উৎপত্তি হয় এবং এই কম্পনের সংখ্যানুসারে শব্দের তীব্রতা ও মৃদুতা হয়—অর্থাৎ ১ সেকেণ্ডে ৩২ বার বায়ুর বিকম্পন হইলে নীচু স্বর এবং উক্ত সময়ের মধ্যে কয়েক সহস্রবার কম্পন হইলে তীব্র স্বর উৎপন্ন হয়, বোধ হয় এ বিষয় তাঁহাদিগকে পুনরায় বুঝাইতে হইবে না। বায়ুর কম্পনে যেরূপ শব্দের উৎপত্তি, "ইথারের" কম্পনে আলোকের উৎপত্তিও তদনুরূপ এবং এই কম্পনের সংখ্যানুসারে নানা বর্ণের আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে। রক্তবর্ণ আলোক নিম্ন স্বরের

সহিত এবং বায়লেট বর্ণ আলোককে তীব্রস্বরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। প্রথমোক্ত বর্ণ প্রতি সেকেণ্ডে ৪৫৭০০ লক্ষ গুণ ইথারের বিকম্পনে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং শেষোক্তটি প্রায় ইহার দ্বিগুণ সংখ্যক বিকম্পনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্বেতবর্ণের আলোক সমস্ত বর্ণের আলোকের সমষ্টি এবং ইহার বিকম্পনে অন্য সমস্ত বর্ণের বিকম্পন একত্রিত আছে। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। কায়স নামক স্থানে সম্প্রতি ভূমিকম্প হইয়া ৪১৮৯ জন হত, ১০১৫ জন আহত হইয়াছে। ১৪০০ গৃহ ভগ্ন এবং ৩। ৪ কোটী টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

২। লণ্ডনে ৪ লক্ষের অধিক শ্রমজীবী রমণী আছে, তন্মধ্যে ২, ২৬, ০০০ স্ত্রীলোক পরিচারিকা,১৬০০০ শিক্ষয়িত্রী, ৫১০০ দপ্তূরী এবং ১৪৮০০ দরজীর কার্য্য করে। ৪৫০০ কৃত্রিম পুষ্প তৈয়ার করে; ৫৮,৫০০ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে, ২৬৮০০ কামিজ তৈয়ার, ও ৪৮০০ বুট তৈয়ার করে; ১০৮০০ সেলাই যন্ত্র চালায় এবং ৪৪০২০ ধোপানীর কাজ করে।

৩। বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যাদ্বয় দেশীয় পরিচ্ছদে পুনরায় ইংলণ্ডেশ্বরীর গৃহে নিমন্ত্রণে উপস্থিত হন। তাঁহাদিগের বেশ দেখিয়া অনেকে প্রশংসা করিয়াছেন।

৪। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড বিকন্সফিল্ড (ডিসরেলী) নিজে যেমন ভাগ্যধর পুরুষ ছিলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সেইরূপ ভাগ্যবতী। তিনি প্রথম বয়সে এক পোষাক-বিক্রেতার দোকানে কর্ম্ম করিতেন, পরে মহারাণীর সহচরী হন।

৫। ১৮৮০ অব্দে লাপলাণ্ডে একটী ঈগল পক্ষী গুলিদ্বারা হত হইয়াছে, ইহার বয়স শতাধিক বর্ষ হইবে অনুমান করা হইয়াছে। এই পক্ষীটী দীর্ঘে ৭ ফুট হইয়াছিল। ১৭৯২ অব্দে আণ্ডারসন নামক এক ব্যক্তি এই পক্ষীকে ধৃত করিয়া দিনামার ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়া

একটী ক্ষুদ্র টীন বাক্সের মধ্যে পূরিয়া ইহার গলায় বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেন। ঈগল গরুড়ের বংশ সন্দেহ ন্যাই।

৬। বস্ত্র ধৌত করিবার এক সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। অর্দ্ধ সের সাবানে অর্দ্ধ ছটাক সোহাগা মিশাইয়া বস্ত্র ধৌত করিলে তাহা উত্তমরূপ পরিষ্কার ও শুভ্র হয়। শুদ্ধ সাবান দিয়া ধৌত করিতে যে পরিমাণ সাবান লাগে, সোহাগার যোগে তাহার অর্দ্ধেকে কার্য্য হয়, পরিশ্রম অল্প হয়, অথচ বস্ত্র অধিক পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

৭। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সকলি কৃত্রিম হইয়া দাঁড়াইতেছে। ফরাসী বিবীদিগের যাঁহাদিগের কাণের গঠন ভাল নয়, তাঁহারা কাণের উপর এক প্রকার সুগঠিত কৃত্রিম কর্ণ ব্যবহার করিতেছেন। কৃত্রিম চুল, দাঁত, চক্ষু যখন হইয়াছে, তখন কৃত্রিম কর্ণ হইবে আশ্চর্য্য কি?

৮। আমেরিকার একটী রমণী রাজদূতের পদ প্রার্থনা করিয়াছেন। ইনি একজন আটর্ণি। রাজদূতের কার্য্য অতিশয় গুরুতর হইলেও তাহাতে যে সকল গুণ আবশ্যক, তাহা অধিকাংশ স্বভাবতঃ স্ত্রীলোক-দিগের আছে। বিদ্যাবতী রমণী কেন না এ কার্য্যের যোগ্য হইবেন।

৯। কিছু দিন হইতে আকাশের উত্তর পশ্চিম কোণে একটী ধূমকেতুর উদয় হইতেছে। সন্ধ্যার পরে ইহা দেখা যায়। ইহার লাঙ্গূল অধিক দীর্ঘ নহে এবং তাহার উজ্জ্বলতাও অধিক নহে।

পুস্তকপ্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। কল্পনা—সমালোচনী মাসিক পত্রিকা, শ্রী হরিদাস বন্দোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত। এই পত্রিকার কয়েক সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। লেখা সরস ও সুপাঠ্য হইতেছে এবং লেখকদিগের যে কল্পনাশক্তি আছে, মধ্যে মধ্যে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

২। বসন্তোপহার—রায়যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।৹ আনা। সামান্যতঃ যে সকল পদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তদপেক্ষা এখানি উচ্চ দরের। ইহা পাঠ

করিয়া লেখকের কবিত্ব-শক্তি দর্শনে আমরা আনন্দিত হইলাম। কবিতাগুলি হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাবোচ্ছ্বাসের পরিচয় দিতেছে। লেখকের প্রথম চেষ্টার ফল যেরূপ উপাদেয় হইয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে তিনি একজন সুকবি বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন আশা করা যায়।

বামাগণের রচনা।

প্রভাতে মনের প্রতি।

ধীরে, ধীরে চলে যায়, শশী সুশীতল।
শর্ শর্ স্বরে বায়ু, বহিছে শীতল॥
ক্রমে দেখ পূর্ব্বদিক্, ফরসা হইল।
জাগরিত হয়ে সবে, অমনি উঠিল॥
শাখা হতে পাখিগণ, উড়ে নানা স্থান।
মন-সুখে নেচে নেচে, করে বিভুগান॥
শশী ভয়ে যেন রবি, ছিল পলায়িত।
প্রভাত হইবা মাত্র, হইল উদিত॥
কি সুন্দর শোভা এবে আকাশ উপর।
উজ্জ্বল হইয়ে রবি উঠিছে সত্বর॥
প্রকৃতির শোভা আহা ! দেখিতে কেমন।
রক্তবর্ণ হয়ে যেন শোভিল ভুবন॥
শুন কত পাখী মিলি ঈশ করে গান॥
মন, তুমি এ সময়ে থেকে না অজ্ঞান
যাঁর দয়া বলে নিশি, করিলে যাপন।
তাঁর পদে কৃতজ্ঞতা কররে অর্পণ॥
অতএব উঠ মন, কত নিদ্রা যাও।
পরমেশ-পদে এবে মিনতি জানাও॥

১২৮৭ ১লা চৈত্র, কালীগঞ্জ। শ্রীমতী সুশীলা।

CALCUTTA

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৯৯ সংখ্যা।	শ্রাবণ ১২৮৮—আগষ্ট ১৮৮১।	২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ষ্টিনোগ্রাফিক মেসিন নামে এক যন্ত্র ফরাসী দেশে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা এক আশ্চর্য্য মুদ্রাযন্ত্র। এক ব্যক্তি যেমন কথা কহিয়া যাইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার কথা মুদ্রিত হইবে। যে কোন ভাষায় কথা কহা যাউক, তাহা যদিও মুদ্রাকারের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত হয়, তথাপি তিনি কথাগুলি মুদ্রিত করিতে পারেন। এই যন্ত্র একটী চাবিদ্বারা পরিচালিত হয়। বর্ণ-মালার ৬টী অক্ষরের সাহায্যে ৭৪টী শব্দ যোজিত হইতে পারে; তদ্দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হয়। অন্ধদিগের শ্রবণ-শক্তি অধিক তীক্ষ্ণ, এই জন্য কাহার কাহার মতে অন্ধেরা মুদ্রাকার হইলে এ কার্য্য অতি সুন্দররূপে চলিতে পারে।

অগ্রে গোরু ঘোড়াতে গাড়ী টানিত, পরে যখন কল টিপিয়া তাহার গতি সম্পন্ন হইতে লাগিল, তখন কত আশ্চর্য্যের বিষয় হইল! তার পর ধোঁয়া ও বাষ্প দিয়া রেলের গাড়ী চলা কত সুবিধাজনক ও আশ্চর্য্য। এখন আবার তাড়িত-রেলগাড়ীর সৃষ্টি হইয়াছে, যে তাড়িতদ্বারা তারে খবর যায়, তাহার জোরে রেলগাড়ী চলিতেছে। ইহার ক্ষুদ্রাকার নমুনা, আমাদিগের

পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহারা আলীপুর 'জুওলজীকেল গার্ডেনে' (পশুশালায়) সম্প্রতি গিয়াছেন, দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহার রীতিমত কার্য্য বার্লিন নগরের নিকট চলিতেছে। তথায় একটী রেলওয়ে কৃতকার্য্য হওয়াতে দ্বিতীয় তাড়িত-রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে। আকাশের বিদ্যুৎকে মানুষ বিজ্ঞানবলে যখন দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন তাহাদ্বারা কত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইবে কে বলিতে পারে?

ইচ্ছাবল যে কি শক্তিশালী তাহা আমরা সচরাচর অনুভব করি না। জগদীশ্বরের ইচ্ছাবলে সমুদায় বিশ্বকার্য্য চলিতেছে, কিন্তু মানুষেরও ইচ্ছা বল সামান্য নহে। ইচ্ছাবল প্রভাবে অনেক দুরাত্মা ব্যক্তির জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে এবং পৃথিবীতে অনেক অসম্ভব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এক ব্যক্তি কেবল ইচ্ছাবলে অপরের রোগ আরোগ্য করিতে পারে, আমরা ইহার দৃষ্টান্তও পাঠ করিয়াছি, সম্প্রতি যে একটী ঘটনা হইয়াছে, ইহাদ্বারা এইমত দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। আমাদিগের কোন সহযোগীর কার্য্যালয়ের নিকটস্থ এক পুষ্করিণীতে ৩ বৎসরের একটী বালিকা জলমগ্ন হয়। তাহাকে যখন তোলা হয়,তখন তাহার পেট জলে পরিপূর্ণ এবং তাহাকে দেখিতে ঠিক মৃত। ইহা দেখিবার জন্য অনেক লোক জড় হয়, তন্মধ্য হইতে একব্যক্তি বালিকাটীকে ধরিয়া বসাইবার ভাবে রাখে এবং সেই শিশুর উপর কিয়ৎক্ষণ কটমট করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া মৃদুভাবে পেটের উপর হাত বুলাইতে থাকে। ১০ মিনিট পরে বালিকাটীর নাক দিয়া নিশ্বাস চলিতে লাগিল, তৎপরে সে ভাত ও জল বমন করিল, ১৫ মিনিটের মধ্যে কাঁদিতে লাগিল এবং অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল। এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দেন, যে তিনি ইচ্ছাবলে শিশুটীকে আরোগ্য করিয়াছেন। অনেক সময় যাহাকে মন্ত্রবল মনে করা হয়, সে এই ইচ্ছাবল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

গত ১৭ই জুলাই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ছাত্রদিগের উপাসনা সভায় এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থা সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর বক্তৃতা

করিয়াছেন। তাহাতে তিনি প্রাচীন ও আধুনিক সময়ের এবং বঙ্গদেশ ও অপরাপর প্রদেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার ছবি উজ্জ্বল বর্ণে প্রদর্শন করেন। শাস্ত্রীয় বচনসকল দ্বারাও সপ্রমাণ করেন, যে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ভারতবাসীদিগের অতি হীন ভাব। গবর্ণমেণ্ট সিন্ধুদেশ-বাসী মুসলমানদিগের মধ্যে স্ত্রীহত্যা এবং রাজপুতানাবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে নৃশংস কন্যাহত্যা প্রথা নিবারণ করিয়া যে মহোপকার করিয়াছেন তাহা বিশেষরূপে বিবৃত করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির হীনাবস্থা, সভ্য-প্রধান ইংরাজ জাতিও অদ্যাপি স্ত্রী-জাতিকে ক্রীড়া পুত্তলিকারূপে দর্শন করেন, তাহাদিগের মানসিক ও আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব সাধনের প্রতি উদাসীন, প্রসঙ্গ ক্রমে ইহাও বর্ণনা করেন। বক্তৃতার উপসংহারে বলেন "The cause of woman is not only the cause of man, but the cause of God." স্ত্রীলোকদিগের কল্যাণ সাধন চেষ্টায় পুরুষদিগের কল্যাণ সাধিত হইবে, অনেকের এই মত, কিন্তু স্ত্রী-জাতির কল্যাণ সাধন ঈশ্বরের কার্য্য; ইহা জানিয়া সকলে এই পুণ্যকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।

বড়লোকে যা করেন, অপর লোকে তাহার কার্য্য কারণ বিবেচনা না করিয়া তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। সচরাচর ইউরোপীর স্ত্রীলোকেরা অশ্বের যে পার্শ্বে পা ঝুলাইয়া বসেন, সম্প্রতি ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠা বধূ তাহার বিপরীত দিকে বসিয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া লণ্ডনের অনেক মহিলা সেই রূপে বসিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের বিবেচনায় ইহাই উৎকৃষ্ট ফ্যাসন!

গ্রীষ্মাবকাশের পর বঙ্গমহিলা সমাজের কার্য্য পুনরারম্ভ হইয়াছে। কয়েকবার অধিক সঙ্খ্যক সভ্যের আগমন ও উৎসাহের সহিত তাঁহাদিগের কার্য্য সম্পাদনের সংবাদ শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। গত ৯ই জুলাই আলোচনা সভায় একজন সভ্য 'সৌন্দর্য্য' বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট রচনা পাঠ করেন। ১লা আগষ্ট বঙ্গমহিলা সমাজের বয়ঃক্রম দুই বৎসর

পূর্ণ হইল, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ইনি দীর্ঘজীবিনী হইয়া আপনার মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন করুন, সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদিগের এই প্রার্থনা।

এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও উন্নতি লইয়া বিলাতেও আলোচনা হইয়া থাকে, এ সংবাদ শুনিয়া আমাদিগের পাঠিকাগণ অবশ্যই আনন্দিত হইবেন। ভারতহিতৈষিণী মিস্ মেরী কার্পেণ্টারের স্থাপিত ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন নামক সভা এ বিষয়ের প্রধান সহায়। গত ২৩এ মে উক্ত সভায় সি, এন্ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারতবর্ষীয় মহিলাদিগের গৃহশিক্ষা, বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। স্ত্রীলোকদিগের গৃহ শিক্ষার সম্পূর্ণ বর্ণনা যদিও ইহাতে দেখিতে পাইলাম না, এবং স্থানে স্থানে একদেশ-দর্শিতার পরিচয় যদিও পাওয়া গেল; কিন্তু ইহাতে এ দেশীয় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় আছে এবং বক্তা তৎসংগ্রহে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে হয়। উক্ত সভার মুখপাত্র পত্রিকার জুন সংখ্যায় এই বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরের প্রাচীন বিবরণ।*

বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন নগর বিষ্ণুপুর দেশীয় পূর্ব্বতন রাজন্যবর্গের একটী প্রসিদ্ধ রাজধানী ছিল। অদ্যাপি ইহা উক্ত প্রদেশের অগ্নিকোণস্থিত ধলকেশ্বর নদের কতিপয় ক্রোশ দক্ষিণে একটী সমৃদ্ধিশালী নগররূপে অবস্থিত আছে। ১৮৭২ সালের গণনানুসারে ইহাতে ৪০০৭টী গৃহ এবং ১৭৪৩৬ জন হিন্দু ও ৬১১ মুসলমান অধিবাসী, সাকল্যে ১৮০৭৪ লোক সংখ্যা দৃষ্ট হইয়াছিল; তন্মধ্যে ৮৮৬৯ জন পুরুষ এবং ৯১৭৪ জন স্ত্রীলোক।

বিষ্ণুপুরের রাজবংশ অতি প্রাচীন এবং পূর্ব্বতন বঙ্গীয় হিন্দু রাজকুলের মধ্যে অতি প্রধান বলিয়া গণ্য। ইহাদিগের সম্বন্ধে যেরূপ জনপ্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

* Hunter's Annals of Rural Bengal. হইতে সঙ্কলিত।

বিষ্ণুপুর-রাজকুলের আদিপুরুষ রঘুনাথ সিংহ। তিনি বৃন্দাবন-সমীপবর্ত্তী জয়নগরের রাজবংশোদ্ভব। জয়নগরাধিপতি বিভিন্ন প্রদেশ দর্শনাভিলাষী হইয়া পুরুষোত্তম যাত্রা করিয়াছিলেন এবং পথিমধ্যে বিষ্ণুপুর পরিদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। যৎকালে তিনি তত্রত্য এক নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে বিশ্রামার্থ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণী একটি পুত্র প্রসব করেন। রাজা সন্তান সমভিব্যাহারে গমন করা কষ্টসাধ্য বিবেচনা করিয়া উক্ত শিশু সন্তান এবং তাঁহার জননীকে বনমধ্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গন্তব্য পথে অগ্রসর হন। ঈদৃশ অমানুষিক পরিবর্জ্জনের কথা অদ্যাপি শ্রুত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরাও তীর্থ যাত্রা সময়ে সন্তানের প্রতি এতাদৃশ ক্রূরাচরণ করেন, অর্থাৎ পথিমধ্যে সন্তান প্রসূত হইলে তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যান।

পিতার প্রস্থানের অব্যবহিত পরে শ্রীকাসমেটিয়া নামক জনৈক বাগ্দি ইন্ধনসংগ্রহার্থ সেই বিশ্রামস্থলের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে এই অসহায় নবপ্রসূত সন্তানকে একাকী সন্দর্শন করিল। তাহার জননীর কথা অতঃপর আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় নাই। তিনি বন্য পশুদ্বারা ব্যাপাদিত হইয়াছিলেন, কি সমীপবর্ত্তী জনপদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় অদ্যাপি গূঢ় রহস্য রহিয়াছে। যাহাহউক, প্রাগুক্ত শ্রমজীবী এই নবজাত শিশু সন্তানকে স্বালয়ে আনয়ন করিয়া সাত বৎসর পর্য্যন্ত লালন পালন করে। এই সময় তত্রত্য জনৈক ব্রাহ্মণ, এই বালকের রূপে মুগ্ধ হইয়া এবং ইহার অঙ্গে সমস্ত রাজোচিত লক্ষণ সন্দর্শন করিয়া ইহাকে স্বীয় ভবনে লইয়া গেলেন। † কিন্তু দরিদ্রতানিবন্ধন তিনি ইহার জীবিকা নির্ব্বাহার্থ স্বীয় ধেনুপালের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই বালক ক্রমে বাগ্দী (আদিম নিবাসী) দিগের এতদূর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল, যে তাহারা ইহাকে 'প্রভু রঘুনাথ' বলিয়া ডাকিত এবং সর্ব্বদা ইহার আহার সামগ্রী আনিয়া যোগাইত।

† পুরাণে আর্য্যজাতির এদেশে আগমনের ইহাই প্রথম আভাস। বর্ণিত মহাত্মা কোনও রূপে বিজয়ী নহেন, প্রত্যুতঃ তিনি এক সামান্য উপনিবেশিক মাত্র ছিলেন।

একদা তত্রত্য বৃদ্ধ মেষপালকের সমক্ষে অপরাপর রাখাল বালকগণের সহিত ক্রীড়া করিবার সময় সে স্বীয় সৌন্দর্য্য দ্বারা সকলের মন সমাকৃষ্ট করিল। অবশেষে বয়োজ্যেষ্ঠেরা দিবাবসান সময় আগত দেখিয়া অসংখ্য পশুপাল সমভিব্যাহারে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। পথিমধ্যে রঘুর যূথ হইতে একটী গাভী পথভ্রান্ত হইয়া অন্যত্র গমন করায় সে তাহার অনুসন্ধানে নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধাধঃ নিরীক্ষণ ও ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক বিফল-মনোরথ ও ক্লান্ত-কলেবর হইয়া বিমর্ষ ভাবে এক তরুতলে উপবেশন করিল। অনতিবিলম্বে সে নিদ্রাকৃষ্ট হইল এবং এক প্রকাণ্ড অজগর সর্প তৃণগুচ্ছের উপর দিয়া শনৈঃ শনৈঃ তথায় আগমন করিল, কিন্তু বালককে দংশন না করিয়া তাহার মুখমণ্ডলোপরি স্বকীয় ফণা বিস্তার পূর্ব্বক তাহার আতপত্র স্বরূপ হইয়া রহিল।* ইতিমধ্যে তাহার ধর্ম্মপিতা তাহার অদর্শনে সাতিশয় দুঃখিত এবং কাতর হইয়া সত্বর তাহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইলেন এবং সভয়ে সেই মৃতকল্প সর্পকর্ত্তৃক আক্রান্ত শিশুকে সন্দর্শন করিয়া "প্রিয় সন্তান, আমি কি উন্মাদগ্রস্ত হইয়া তোমাকে বনে প্রেরণ করিয়াছিলাম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে সর্প তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া ফণা সঙ্কোচন পূর্ব্বক দ্রুতবেগে তথা হইতে চলিয়া গেল এবং বালকও ছায়া প্রত্যাহৃত হওয়ায় চমকিত হইয়া গাত্রোত্থান করিল। বৃদ্ধ, কৃতজ্ঞতা রসে অভিষিক্ত হইয়া আর কখনও উহাকে বনে প্রেরণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'হায়! যদি আমি তোমাকে হারাইতাম, তাহাহইলে আমার কি দশা হইত? তোমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি নয়নের অন্তরাল করিতে পারি না। যে দিন আমি তোমাকে জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত বান্দি কর্ত্তৃক প্রতিপালিত অবস্থায় স্বীয় আলয়ে আনয়ন করিয়াছি, সেই দিন হইতে তোমার প্রতি আমার অটল ও অনির্ব্বচনীয় স্নেহ জন্মিয়াছে। তোমার সুচন্দ্রবদন এবং বাষ্প-বারি-বিগলিত নয়নদ্বয় কখনও বিস্মৃত হইবার নহে।'

* জন প্রবাদানুবর্ত্তী বিবিধ দৈব ঘটনার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

একদা এই বালক, জলপ্রবাহমধ্যে একটি সুবর্ণ-গোলক প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রভু সন্নিধানে আনয়ন করিল। ইহাই বালকের ভাবী মহত্ত্বের লক্ষণ মনে করিয়া তিনি অপরিসীম সন্তোষ সহকারে উহা গ্রহণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তদ্দেশাধিপতির লোকান্তর হইলে মহাড়ম্বর সহকারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইল এবং বিবিধ জনপদ হইতে লোকগণ তাঁহার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে আগমন করিল। প্রাগুক্ত ব্রাহ্মণ, দারিদ্র্যনিবন্ধন রঘুর সমভিব্যাহারে তথায় গিয়াছিলেন। যখন ব্রাহ্মণের ভোজনের অর্দ্ধাবশেষ রহিয়াছে, এমন সময় রাজহস্তী রঘুকে শুণ্ডে উত্তোলন করিয়া রিক্ত সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হইল। কি জানি হস্তী এক আঘাতেই বালককে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, এই ভাবিয়া সকলেরই নিতান্ত ভয় ও বিস্ময় জন্মিল। কিন্তু যখন রাজমাতঙ্গ নিরতিশয় সতর্কতা সহকারে বালককে রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইল, তখন সমগ্র লোকমণ্ডলী ঈদৃশ অনম্ভাবিত প্রকারে ঈশ্বরেচ্ছা সম্পন্ন হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল এবং মন্ত্রিগণ এই বালককেই সিংহাসনোপবিষ্ট রাখিতে সম্মত হইলেন। অবশেষে তাঁহারা তাহাকে তৎপ্রদেশের রাজপদে অধিষ্ঠিত করিলেন। অতঃপর বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহকারে তান লয় মান সুসঙ্গত সঙ্গীত এবং তৎসঙ্গে সুমধুর বীণাধ্বনি হইতে লাগিল, তন্ত্রীগণ স্ব স্ব যন্ত্রসংযোগে শ্রবণবিবরে অপূর্ব্ব সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল এবং এই অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক কাণ্ডের পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল।

প্রাচীনকালে এ দেশের অনেক স্থলে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল, যে রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রিয় হস্তীকে বিবিধ মণি মাণিক্যে বিভূষিত করিয়া রাজধানীর প্রশস্ত বর্ত্মে ছাড়িয়া দেওয়া হইত এবং সমস্ত রাজপারিষদবর্গ তাহার অনুগামী হইতেন। এই জনতার মধ্য হইতে সে যাহাকে স্বীয় পৃষ্ঠোপরি উপবেশন করাইত, তাহাকেই তাঁহারা রাজা বলিয়া গ্রহণ এবং রাজপদে অভিষেক করিতেন। তাঁহারা ভূতপূর্ব্ব রাজার উত্তরাধিকারিগণকে কদাপি রাজত্ব প্রদান করিতেন না এবং ঈদৃশ কাণ্ডই ঈশ্বরাভিপ্রেত বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং উল্লিখিত নিয়মানুসারে রঘুনাথ সিংহই বিষ্ণুপুরের প্রথম আর্য্যবংশোদ্ভব রাজা হইলেন। ইতিহাসে তিনি বাগ্‌দি বংশীয় প্রথম

রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই বংশ প্রায় একাদশ শত বর্ষ ব্যাপিয়া রাজত্ব করিয়াছে। কথিত আছে তিনি দৈববাণী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বিষ্ণুপুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজ্য বহুকাল মালভূমি (মল্ল স্থান) নামে পরিচিত ছিল। অতঃপর জঙ্গল মহল (বন প্রদেশ) নামে অভিহিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে উহা বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া এবং বীরভূম জেলা ভুক্ত হইয়াছে।

বীরভূম, বাগ্‌দি বীরপুরুষগণের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। তাহারা দীর্ঘকেশ ধারণ করিত এবং সাধারণতঃ লৌহ ভুষণে বিভূষিত হইত। অবস্থানুসারে রৌপ্যবালাও ব্যবহার করিত। তাহারা স্বভাবতঃ শল্য এবং বল্লমধারী ছিল। মল্ল-বিদ্যায় পারদর্শিতানিবন্ধন রাজারা তাহাদিগকে প্রহরী স্বরূপ নিযুক্ত করিতেন। তাহারা বন্যজাতিদিগের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া মধ্যে মধ্যে অপরের সর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠনপূর্ব্বক নিরীহ প্রতিবেশীগণের ভীতি উৎপাদন করিত। যুদ্ধকালে মুর্শিদাবাদের নবাব প্রয়োজনানুসারে তাহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। যৎকালে নবাব, মারহাট্টাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন তিনি অধীনস্থ রাজন্যবর্গকে তাঁহার সহায়তা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে বিষ্ণুপুরাধিপতি একদল প্রবল সাহসী যোদ্ধ পুরুষকে নবাবের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। তাহাদিগের অপরিসীম শৌর্য্যে অচিরে মারহাট্টাগণ পরাজিত হয়, এবং সেই সময় হইতেই নবাবের করদ রাজগণ মধ্যে বিষ্ণুপুরাধিপতি সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন।

বাঁকুড়া জেলার কালেক্টরী কাছারীতে রাজা গোপাল সিংহ কর্ত্তৃক লিখিত বিষ্ণুপুর রাজন্যবর্গের একখানি ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রধানতঃ সেই গ্রন্থ অবলম্বন এবং অন্যান্য নানাবিধ বিবরণ হইতে সংগ্রহ করিয়া হণ্টার সাহেব যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা হইতে রাজাদিগের যৎকিঞ্চিৎ বিবরন গৃহীত হইল।

এই রাজগণ মহর্ষিবংশের কৌথুমি শাখা হইতে উদ্ভূত। কেটি জাতীয় অকলঙ্ক ও পুরা ইহাদিগের উপাস্য দেব ও দেবী। ইহারা শব্দের শিষ্য এবং বিশ্বামিত্রই ইহাদিগের সর্ব্বপ্রধান ঋষি। যে সকল ব্রাহ্মণ বিষ্ণুপূজা করেন, তাঁহারাই ইহাদিগের পুরোহিত। ইহাদিগের পবিত্র ভাষার নাম গাথা। রাজারা উপনয়নের সময় উহা শিক্ষা করিতেন এবং অদ্যাপি উহা প্রচলিত

আছে। ইতিহাসে রাজা রঘুনাথ সিংহের সময় হইতেই বিষ্ণুপুরের নাম দৃষ্ট হয়। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সময় তিনি আদিমল্ল (প্রথম মল্ল) বলিয়া অভিহিত হইতেন।—

১। আদিমল্ল বা রঘুনাথ সিংহ—এই রাজা বঙ্গীয় ১২২ শকে (৭১৫ খ্রীঃ অব্দে) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ললাটে রাজচিহ্ন বিদ্যমান ছিল, এবং তিনিই বিষ্ণুপুরের প্রথম আর্য্য রাজা হয়েন। তিনি ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মহিষী চন্দ্রকুমারি চন্দ্রবংশোদ্ভব রাজা ইন্দ্র সিংহের দুহিতা ছিলেন, পাহেশ্বরী দেবীর অর্চ্চনার্থ তিনি একটি দেবালয় নির্ম্মাণ করেন। লাউগ্রামে তাঁহার রাজধানী ছিল।

২। রাজা জয়মল্ল।—ইনি বঙ্গীয় ১৫৬ শকে (৭৪৯ খৃঃ অব্দে) জন্মগ্রহণ করেন এবং বিষ্ণুপুরীয় ৩৪ শালে রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। ইনি ৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়া বিষ্ণুপুরীয় ৬৪ সনে লোকান্তর গমন করেন। ইনি চন্দ্রবংশীয় রাজা দিনু সিংহের দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শত শক বেহারীর উপাসনার্থ রাজা জয় সিংহ একটি দেবালয় নির্ম্মাণ করেন। ভাগীরথী-গোপ ইহার কামদার অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি অথবা মন্ত্রী ছিলেন। তিনি মল্লভূমির রাজস্ব পাইতেন। এই রাজার দুই পুত্র ছিল; জ্যেষ্ঠ সিংহাসনাধিরোহণ করেন এবং কনিষ্ঠ ভূতিভুক্ স্বরূপ থাকেন। ইনি অতি প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন এবং ইহার সৈন্যসংখ্যা অনেক বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

৩। রাজা অম্বুচন্দ্র (অথবা বেণীমল্ল) ইনি ৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিষ্ণুপুরীয় ৬৪ সালে রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন। দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করণানন্তর ইনি ৭৬ সনে কালগ্রাসে নিপতিত হয়েন। ইহাঁরও লাউগ্রামে রাজধানী ছিল। ইহাঁর মহিষী কাঞ্চনমনি, চন্দ্রবংশীয় মতিয়ার সিংহের দুহিতা ছিলেন। ভূতপূর্ব্ব রাজার জনৈক পদস্থ কর্ম্মচারী ভাগীরথী সিংহ ইহাঁর কামদার ছিলেন। এই রাজার পাঁচ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজা এবং অবশিষ্টেরা বেতনভোগী হয়েন। ইহাঁদিগের আর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না।

এইরূপে পণ্ডিত হণ্টার, রাজগণের এক সুদীর্ঘ তালিকা প্রদান করিয়াছেন। এই রাজারা সকলেই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলস্থিত আর্য্যবংশোদ্ভব

ক্ষত্রিয় রাজকন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা সর্ব্বদাই সমীপবর্ত্তী রাজগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিতেন। প্রতিদ্বন্দী রাজগণের অধিকাংশই আদিম নিবাসী ছিল, কচিৎ আর্য্যবংশীয়ও দৃষ্ট হইত। প্রাগুক্ত রাজগণ প্রধানতঃ আর্য্য দেবতা গণের উপাসনার্থই দেবালয় নির্ম্মাণ করিতেন, কিন্তু দেশীয় আদিমনিবাসীদিগের প্রচলিত রীত্যনুসারে সময়ে সময়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রেতাত্মার উদ্দেশেও মঠ নির্ম্মিত হইত। আমরা নিদর্শন পত্র সকল পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, আদিম অধিবাসীদিগের প্রাধান্য ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উল্লিখিত পণ্ডিতের অনুবর্ত্তী না হইয়া আমরা ইতিহাস অনুসারে ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত কতিপয় বিখ্যাত রাজার দৃষ্টান্ত মাত্র পশ্চাৎ প্রদর্শন করিব।

ক্রমশঃ

বড় লোক।

নশিবাবু বড়লোক। তাঁহার পিতা বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ সঙ্গতি রাখিয়া গিয়াছেন। নশি বাবুর সুন্দর সুন্দর গাড়ি আছে, ঘোড়া আছে, অসংখ্য দাস দাসী আছে; সকাল সন্ধ্যা নিয়তই দুই চারিজন লাভের প্রত্যাশায় তাঁহার উমেদারি করিয়া যায়,—নশি বাবু মনে মনে ভাবেন 'আমি বড়লোক' এবং পাড়ার পাঁচজনেও তাহাই বলিয়াথাকে। সুতরাং প্রথমে আমরাও স্থির করিয়াছিলাম যে নশিবাবু অবশ্যই একজন বড়লোক হইবেন। কিন্তু পরে আমাদের জানিতে ইচ্ছা হইল যে কেমন করিয়া তিনি বড়লোক বলিয়া পরিচিত হইলেন। তাঁহার অবশ্যই বিশেষ কোন গুণ থাকিবে, নহিলে লোকে তাঁহাকে বড়লোক বলিবে কেন?

এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য আমরা নশিবাবুর কয়েকটি প্রতিবাসীর নিকট সন্ধান লইলাম। আমরা প্রথমেই তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু যে পরিচয় পাইলাম তাহাতে বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল না। পরে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করায়

যাহা যাহা শুনিলাম তাহাতে পূর্ব্বে যে শ্রদ্ধা টুকু ছিল তাহাও আর রহিল না। নশিবাবু বিপুল অর্থের অধিপতি, সুতরাং বিষয় কর্ম্মে তাঁহার কিরূপ পারদর্শিতা তাহারও সন্ধান লইলাম। কিন্তু শুনিলাম যে তাঁহার হস্তে পড়িয়া পৈতৃক সম্পত্তির হ্রাস বৈ বৃদ্ধি কস্মিন্ কালে হয় নাই। তথাপি নশিবাবু বড় লোক। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি অতি সামান্য, তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ না করাই ভাল, তাঁহার বিষয় বুদ্ধিও তথৈবচ,—কিন্তু তাহা হইলেও নশিবাবু একজন বড়লোক, কারণ তাঁহার বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা আছে, তাঁহার সুন্দর সুন্দর গাড়ি ঘোড়া আছে; তাঁহার অনেক জমিদারি ও কোম্পানির কাগজ আছে। বড়লোক হইবার জন্য ইহার অধিক তুমি আর কি চাও?

উপস্থিত বিষয়টি লিখিতে লিখিতে হঠাৎ একটী অনেক দিনের কথা মনে পড়িতেছে। আমি বাল্য কালে যখন শুনিতাম যে 'অমুক মহাশয় একজন বড়লোক,' 'তাঁহার প্রতিবাসী কিম্বা আত্মীয় অমুক মহাশয়ও খুব্ একজন বড়লোক,' আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিতাম 'বড়লোক কাহাকে বলে?' পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম যে 'যাঁহারা বড়লোক বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের দেহ আর সকল মানুষের দেহাপেক্ষা দীর্ঘে প্রস্থে অবশ্যই অনেক বৃহৎ হইবে, নহিলে লোকে বড়লোক বলিবে কেন? হয়ত তাঁহাদের মস্তক কড়িকাষ্ঠে গিয়া লাগে; হয়ত তাঁহাদের জন্য ঘরের স্বতন্ত্র দ্বার রাখিতে হয়।' পাঠিকা! বড়লোকের এই অর্থ পড়িয়া বোধ হয় তুমি মনে মনে হাসিবে। তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কারণ আমি নিজে মধ্যে মধ্যে না হাসিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বেস্ বুঝিতে পারিবে যে যাঁহারা সচরাচর বড়লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই এই দরের বড়লোক। সুবোধ পাঠিকা, তুমি অবশ্যই অনেক 'বড়লোক' দেখিয়াছ, এবং হয়ত মনে মনে ভাবিয়াছ যে 'ইহারাই সমাজের মস্তকস্বরূপ, ইহাদের অবর্ত্তমানে সমাজ একদিনের জন্য জীবিত থাকিতে পারে না।' অতএব অনুরোধ করিতেছি একবার ভাবিয়া দেখ যথার্থ বড়লোক কাহাকে বলে। যাঁহারা পৈতৃক ধনে ধনী, যাঁহারা সেই ধনের কিরূপে সদ্ব্যবহার করিতে

হয় তাহা জানেন না, যাঁহারা স্বহস্তে কখন একপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন না, তাঁহারা যদি বড়লোক হইলেন তবে জগতে বড়লোক নহে কে? মনুষ্য হইলেই যদি বড়লোক হয়, তবে অবশ্য তাঁহারাও বড়লোক। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে যদি কোন প্রভেদ থাকে, এবং সেই প্রভেদ দেখিয়াই যদি একজনকে বড়লোক বলি এবং আর একজনকে বলি না, তাহা হইলে অতি সাবধান হইয়া বড়লোক শব্দটী ব্যবহার করা উচিত।

যদি বড়লোক বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে পরিশ্রমকে সহায় করিয়া স্বহস্তে উপার্জ্জন করিতে শিক্ষা কর। যিনি ন্যায় পথে থাকিয়া বিপুল অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম, তিনি অবশ্যই বড়লোক, কারণ বহু সদ্গুণ না থাকিলে কেহই এই ব্রতে সফল হইতে পারে না। শুধু উপার্জ্জন করিতে শিখিলেই যথেষ্ট হইল না, উপার্জ্জিত অর্থের কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহাও শিক্ষা কর।

অর্থোপার্জ্জনের অপেক্ষা বড়লোক হইবার আরও অনেক উৎকৃষ্টতর উপায় আছে। বড়লোক হইতে হইলে মন, হৃদয়, বিবেক ও আত্মাকে বড় করিতে হয় অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া মনের উন্নতি করিতে হয়, সকলকে ভাল বাসিয়া ও সকলের মঙ্গল সাধন করিয়া হৃদয়কে প্রশস্ত করিতে হয়, ন্যায় ও সত্য পথে অটল থাকিয়া বিবেককে জয় যুক্ত করিতে হয় এবং পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের পুণ্যভাবের মধ্যে আত্মাকে নিমগ্ন রাখিয়া পুণ্য জীবন ধারণ করিতে হয়। পাঠিকা! যদি তোমার বড়লোক হইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা প্রশংসা বৈ নিন্দার কথা নহে। কিন্তু এইটী নিশ্চয় জানিও যে কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ব্যতীত জগতে কেহ কখন বড়লোক হইতে পারে নাই। আলস্য ভুলিয়া যাও, দীর্ঘসূত্রতা তুলিয়া দাও, এবং এই সকল ভুলিয়া গিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে মনোনিবেশ কর, নীতিশাস্ত্রের দৃঢ় বন্ধনে হৃদয়কে সবল কর, পরের দুঃখে কাঁদিতে শিখ, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে শিখ, ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া জীবনের সকল কার্য্য সাধন কর, তাহা হইলে তুমি 'বড়লোক' হইবে——ভগ্নি, তোমার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইবে।

ফ্ল্যাক্স্‌ম্যান্ ও তাঁহার পত্নী আন্ ডেন্‌ম্যান্

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে সার্ যশুয়া রেণলডস্ নামে এক জন বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন। জীবদ্দশায় তাঁহার যশের সৌরভে ইউরোপ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এবং অদ্যাপি তাঁহার নাম সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রের নিকট বিশেষ পরিচিত। সার্ যশুয়া শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের জন্য বিপুল পরিশ্রম করিতেন। অধিক কি, পাছে সংসারে বিব্রত হইয়া পড়িলে শিল্পানুশীলনে ব্যাঘাত জন্মে, এই আশঙ্কায় তিনি স্বয়ং কখন দার পরিগ্রহ করেন নাই, এবং অপরাপর শিল্পীদিগকেও দার পরিগ্রহ করিতে সর্ব্বদা নিষেধ করিতেন। তৎকালে জন্ ফ্ল্যাক্স্‌ম্যান্ নামে এক যুবক শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। সপ্তবিংশ বৎসর বয়সে তিনি আন্ ডেন্‌ম্যান নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ফ্ল্যাক্স্‌ম্যান্ তৎকালে প্রসিদ্ধনামা শিল্পী বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন নাই। বিবাহের কিছু দিন পরে সার্ যশুয়ার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উল্লিখিত সার্ যশুয়া শিল্পীদিগকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিতেন। সুতরাং তিনি ফ্ল্যাক্স্‌ম্যান্‌কে দেখিয়া বলিলেন—'ফ্ল্যাক্স্‌ম্যান্, শুনিলাম তুমি না কি বিবাহ করিয়াছ? তাহা যদি করিয়া থাক, তবে নিশ্চয় জানিও যে শিল্প বিদ্যায় তুমি কস্মিন্ কালে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।' সার্ যশুয়া এক জন বিখ্যাত শিল্পী, সুতরাং তাঁহার কথা শুনিয়া ফ্ল্যাক্স্‌ম্যানের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। তিনি বিষণ্ণ বদনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় তাঁহার পত্নী আন্ ডেন্‌ম্যান্‌কে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় প্রেমে উথলিয়া উঠিল। তিনি কোন কথা না বলিয়া পত্নীর পার্শ্বে গিয়া বসিলেন, এবং তৎপরে তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মধুর সম্ভাষণ করিয়া করুণস্বরে বলিলেন—'আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শিল্প বিদ্যার সমস্ত আশা ভরসা চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইয়াছে।' প্রিয়কারিণী আন্ ডেন্‌ম্যান্ স্বামীর দুঃখে অতীব দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'জন্,! এমন সর্ব্বনাশ কে করিল? জন্ ফ্ল্যাক্স্‌ম্যান্ পুনরায় করুণস্বরে বলিলেন—'উপাসনা মন্দিরে (১) আমার এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এবং

(১) উপাসনা-মন্দিরে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

আন্ ডেন্‌ম্যান্ তাহার কারণ।' এই কথা শুনিয়া ডেন্‌ম্যানের মনে বড় কষ্ট হইল। অন্য কোন স্ত্রী হইলে হয়ত এ অবস্থায় স্বামীর উপরে রাগ করিতেন। কিন্তু ডেন্‌ম্যান্ রাগ করা দূরে থাকুক, বরং আপনাকে অপরাধিনী ভাবিয়া কি অপরাধ করিয়াছেন জানিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তখন ফ্লাক্স্‌ম্যান্, সার্ যশুয়া যাহা বলিয়াছিলেন ও তাঁহার বাক্যের যে গূঢ় তাৎপর্য্য, তাহা পত্নীকে সবিশেষ বুঝাইয়া বলিলেন। শিল্প-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে অনন্যমনে তাহাতে চিত্ত নিবেশ করা উচিত, এবং রোম নগরে যাইয়া সেখানকার জগদ্বিখ্যাত শিল্প কার্য্য সমূহ অধ্যয়ন করা আবশ্যক। যিনি সংসার চিন্তায় ব্যস্ত থাকিবেন, তাঁহার পক্ষে ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ডেন্‌ম্যান্ স্বামীর বাক্যে আশ্বস্তা হইয়া উত্তর করিলেন—'জন্, ইহার আর ভাবনা কি? আমি বলিতেছি তুমি নিশ্চয়ই রোম নগরে যাইতে পারিবে।' ফ্লাক্স্‌ম্যান্ জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন করিয়া?' ডেন্‌ম্যান্ পুনরায় বলিলেন—'অর্থোপার্জ্জন কর, এবং বুঝিয়া ব্যয় কর।'

পত্নীর আশ্বাস বাক্যে ফ্লাক্স্‌ম্যানের অন্তরে এক নূতন জীবন-সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন 'আমি অচিরে রোমে যাইব এবং সার্ যশুয়াকে দেখাইব যে বিবাহ করিয়া লোকের মঙ্গল ব্যতীত কদাচ অমঙ্গল হয় না।' তদবধি পাঁচ বৎসরকাল তাঁহারা কঠিন পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কাহাকে কোন কথা বলিলেন না। অবশেষে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইল। ফ্লাক্স্‌ম্যান্ সস্ত্রীক রোম নগরে যাত্রা করিলেন, এবং সেখানকার মনোহর শিল্পকার্য্য সমুদয় অধ্যয়ন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং একজন প্রতিভাশালী শিল্পী বলিয়া সকলের নিকট আদরণীয় হইলেন।

ফ্লাক্স্‌ম্যানের নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার এই খ্যাতির প্রধান কারণ সেই গুণশালিনী আন্ ডেন্‌ম্যান্। যখন নৈরাশ্যে স্বামীর হৃদয় নিশ্চেষ্টপ্রায় হইল, ডেন্‌ম্যান্ তখন তাঁহার অন্তরে নবোৎসাহ সঞ্চার করিতে লাগিলেন। তিনি আশা ভরসা দিয়া স্বামীকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিলেন, এবং আহ্লাদের সহিত তাঁহার ক্লেশভাগিনী হইলেন। কিসে ভর্ত্তা কিঞ্চিৎ সঙ্গতি করিয়া রোম নগরে যাত্রা করিতে পারেন, কিসে

তাঁহার মহদুদ্দেশ্য সফল হয়, তিনি অনুক্ষণ এই চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া কেবল যাহাতে স্বামীর যশোলিপ্সা চরিতার্থ হয়, যাহাতে স্বামীর নাম দেশ বিদেশে বিখ্যাত হয়, সেই চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ ডেন্‌ম্যানের চরিত্র অধ্যয়ন করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে স্বামীর উদ্দেশ্য সিদ্ধি ব্যতীত অন্য চিন্তা, অন্য আশা, অন্য অভিলাষ, তাঁহার হৃদয়ে কিছুমাত্র ছিল না। পত্নীর একটী প্রধান কর্ত্তব্য কি তাহা ডেন্‌ম্যান্ যথার্থই বুঝিয়াছিলেন। স্বামীকে স্নেহ ও মমতা করা স্ত্রীর পরম ধর্ম্ম বটে, কিন্তু শুদ্ধ তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল না। স্বামীর হৃদয় যে সকল গভীর চিন্তায় আলোড়িত হয়, যে সকল অসাধারণ ও অত্যুচ্চ আশায় উৎক্ষিপ্ত হয়, যে সকল মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাকুল হয়, তাহাতে যিনি সহকারিণী হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ পতিব্রতা রমণী। আন্ ডেন্‌ম্যান্ এই প্রকৃতির পত্নী ছিলেন। পাঠিকা, বলিতে পার তাঁহার মত রমণী বঙ্গদেশে কয়জন আছেন ?

গার্হস্থ্য-শিক্ষা।

তৃতীয় অধ্যায়।

(১৮৫ সংখ্যা, ৪১ পৃষ্ঠার পর)

পূর্ব্বকালের স্ত্রী-জাতির মধ্যে কিরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত ছিল, গৃহিণীরা বালক-বালিকাদিগকে কি প্রকার ভাষায় উপদেশ দিতেন, তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত "গার্হস্থ্য শিক্ষা" নামক প্রস্তাব সঙ্কলিত হইয়া আসিতেছে। সেকালের প্রাচীনা স্ত্রীলোকদিগের যে সকল সারগর্ভ উপদেশ অদ্যাপি স্ত্রী-সমাজে প্রচলিত আছে, তৎসমুদায় বাক্যকে এক প্রকার কবিতা বলিলেও বলা যায়, ইহা দেখিয়া আমরা সেই কবিতা রচয়িত্রীদিগকে "স্ত্রী-কবি" আখ্যা প্রদান করিয়াছি। পুরুষেরা ভাষায় পণ্ডিত, সুতরাং তাঁহাদের ভাষা সুশ্রাব্য। স্ত্রীলোকদিগের ভাষাধিকার অল্প ; এজন্য তাঁহাদের কবিতা

তত সুশ্রাব্য নহে। স্ত্রী-ভাষা যেন স্বতন্ত্র ভাষা, কিন্তু তাহার মধ্যে যে অমূল্য ভাব আছে, তাহা কখন উপেক্ষণীয় হইতে পারে না।

অনেকে বুঝিয়া রাখিয়াছেন, লিখিতে ও পুস্তক পড়িতে পারিলেই জীবনের সমস্ত শিক্ষণীয় সম্পন্ন হইল। এটি বড় ভ্রম। গুটিকতক অক্ষর আঁকিতে পারা ও পাখীর ন্যায় পড়িতে শেখাকে কোন ক্রমেই জীবনের প্রধান কার্য্য বলা যাইতে পারে না। অক্ষর অভ্যাস করিয়া অলস, দুর্ব্বল, অহঙ্কারী, বিদ্যাভিমানী, পরিশ্রমাক্ষম, ও বিলাসী হওয়া অপেক্ষা কার্য্যশিক্ষা বা অধ্যয়নের ফল শিক্ষা করা ভাল। অনেকে কিছুমাত্র লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, সারল্য, ও দয়াদি স্বর্গীয় গুণে পরিপূর্ণ। এই সকলই লেখাপড়ার অমৃত তুল্য উৎকৃষ্ট ফল, ইহা সহজে পাইবার জন্যই লেখাপড়ার সৃষ্টি। পাখীর মত পড়ায় ও আঁকোড়নের ন্যায় লেখায় কোন সুফল নাই। পূর্ব্বকালের নারীরা অক্ষর আঁকিতে জানিতেন না; হড় হড় করিয়া পড়িতেও পারিতেন না। কিন্তু শুন দেখি, তাঁহাদের মুখ হইতে কেমন একটি উপদেশপূর্ণ আশ্চর্য্য কবিতা বাহির হইয়াছিল, যাহা শত শত জ্ঞান-শাস্ত্র অধ্যয়নের ফল!!—

"সুখ্ সুখ্ মনের সুখ্, যার আছে তার আছে
দুঃখের ভিতর সুখ"
"সুখ্ কি অম্‌নি হয়? কর্‌তে জান্‌লে হয়।"
"যদি থাকে মন, কি করিবে ধন?"
"যার নেই উত্তর পূব, তার মনে সদাই সুখ।"

এই কয়েকটী স্ত্রী-কবিতার মধ্যে কি আশ্চর্য্য জ্ঞানরত্নের জ্যোতি নিহিত আছে, একবার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখ। সুখ কি পদার্থ, কেমন করিয়া তাহা ভোগ করিতে হয়, অনেকে তাহা জ্ঞাত নহেন। নিরন্তর সুখ-তৃষ্ণায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবল দুঃখেই দগ্ধ হইতে থাকেন। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সুখও শিক্ষা ও অভ্যাসের অধীন। শিক্ষা না করিলে, অভ্যাস না করিলে, ধনী ব্যক্তিও সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন না। সুখে কাল কর্ত্তনের জন্য কি কি শিক্ষা ও অভ্যাস করিতে হয়, তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। ধন সুখের উপকরণ বটে, কিন্তু সুখভোগের পন্থা না জানিলে তদ্দ্বারা সুখী

হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বাক্যব্যয় করিতে হয় না, মদমত্ত ধনীদিগের পরিণাম দোষেই প্রতীত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত স্ত্রী-কবিগুলি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, যে সুখ মনের ধন, বহির্বিষয় সকল অনুকূলভাবে অনুভব করাই সুখ; অভাবের অভাব, যাহাকে শান্তি বলে, তাহাই সুখ। শান্ত, সহিষ্ণু, ধীর, অচঞ্চল, অলোভী ব্যক্তিরাই তাহা সর্ব্বদা অনুভব করিয়া থাকে। অতএব,সুখী হইবার ইচ্ছা থাকিলে ঐ সকল গুণ আয়ত্ত করা আবশ্যক। এই কয়েকটি কবিতা হইতে ইত্যাকার অনেক প্রকার উপদেশ বাহির করা যাইতে পারে।

শিক্ষা ও অভ্যাস গুণে যেমন স্বল্প বিষয়েও সুখী হওয়া যায়, সেইরূপ দুঃখেরও লাঘব করা যাইতে পারে। তাহারই নাম "দুঃখের ভিতর সুখ।" ধননাশ, বন্ধু-বিচ্ছেদ, ও রোগ প্রভৃতি বিবিধ কারণে দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে; পরন্তু পুরুষ কি স্ত্রী যদি শিক্ষিত বা অভ্যাস-পটু হন, তাহাহইলে কখনই দুঃখভারে অভিভূত হইয়া মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। অতএব দুঃখের মধ্যে সুখ অনুভব করিবার জন্য সহিষ্ণু অর্থাৎ সহ্য-গুণ-সম্পন্ন হইতে হয়। স্ত্রী-কবিও তাহাই বলেন, যথা—

"শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াও তাই সয়।
"যে সয় সেই রয়"
"সহ্য গুণ বড় গুণ, যার আছে সেই জন।"

(সওয়াও—সহ্য করাও। সয়—সহ্য হয়। সয়—সহ্য কর। রয়—অর্থাৎ সে অভিভূত বা নষ্ট হয় না। সেই জন—অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই সুখী)

ইত্যাদি ইত্যাদি স্ত্রী-কবিতা পাঠে জানা যায় যে, জ্ঞান-ধন পূর্ব্বকালের অনক্ষরা স্ত্রী-হৃদয়েও আশ্রয় পাইত। আমাদের প্রার্থনা এই যে এক্ষণকার রমণীগণ অক্ষর পড়িতে শিখিয়াছেন বলিয়া যেন প্রকৃত বিষয়ে অন্ধ ও বধির না হন। তাঁহারা যেমন লেখা পড়া শিখিয়া সভ্য ও বিদ্যাবতী হইতেছেন, সেইরূপ প্রকৃত জ্ঞান ও নীতিরত্নে আপনাদের জীবনকে বিভূষিত করুন।

চতুর্থ অধ্যায়।

সুস্বাদু ও গুণকর অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ করা ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে বিধেয়। তাদৃশ অন্নব্যঞ্জন আঢ্য ব্যক্তিদিগের গৃহেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, ধনহীন ব্যক্তিদিগের গৃহে সেরূপ অন্নব্যঞ্জন দুর্লভ; কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য তাঁহাদেরও তাদৃশ হিতকর অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য এবং তাহা কোন কৌশল অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাহ করা আবশ্যক। সে কৌশল পাক বিদ্যার প্রশাখা। পাকবিদ্যা জানা থাকিলে অতি যৎসামান্য দ্রব্যকেও সুরস ও হিতকর করিয়া লওয়া যাইতে পারে—বনজ শাক পাত, মিঠাই মণ্ডা অপেক্ষা তৃপ্তিকর হইতে পারে।

স্বাদু ও গুণকর অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ করিলে শরীর ভাল থাকে; মন ভাল হয়; বল, বর্ণ, তেজঃ, দৈহিক কান্তি বা লাবণ্য সমস্তই বৃদ্ধি পায়; আর বিস্বাদ দুষ্পাচ্য কদর্য্য অন্ন ব্যঞ্জন ভক্ষণ করিলে শরীর ক্রমে রুগ্ন হইতে থাকে; বর্ণের মালিন্য জন্মে; কান্তি থাকেনা; মন ও ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হইতে থাকে; সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ক্রমে দুর্লভ হইয়া পড়ে।

দুষ্পাচ্য কদর্য্য অন্ন ভদ্রলোকের পক্ষে যত অহিতকর, কৃষকাদি শ্রম-জীবিদিগের পক্ষে তত নহে। তাহার কারণ এই যে, ব্যায়াম বা পরিশ্রমের দ্বারা তাহাদের শিরা প্রভৃতি সবল ও জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত থাকে। সুতরাং সহজে পরিপাক করিবার শক্তি প্রবল হইয়া থাকে। এই জন্য তাহারা কুৎসিত অন্ন ভক্ষণ করিয়াও অবসন্ন হয় না। যতই কেন মন্দ ভক্ষ্য হউক না, যদি তাহা উত্তমরূপে জীর্ণ হয়, তাহা হইলে এমন কি বিষও অনিষ্ট আনয়ন করিতে পারে না। যাঁহারা সুনিয়মে পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের শরীর দৃঢ়, অস্থি কঠিন, শিরাসকল সতেজ থাকে এবং রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া যথানিয়মে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং তাদৃশ অবস্থার লোকের পক্ষে কঠোর খাদ্যও উপকার বর্জ্জিত হয় না। কারণ, তাহাদের সতেজ জঠরাগ্নিতে যাহা পড়িবে তাহা সুনিয়মে জীর্ণ হইয়া রস রক্তাদি উৎপাদন করিবে। কিন্তু যাঁহাদের নিয়মিতরূপে শারীরিক পরিশ্রম করা ঘটিয়া উঠে না, তাঁহাদের পক্ষে বিস্বাদ ও কদর্য্য খাদ্য অত্যন্ত দূষণীয়।

মনুষ্যের ক্ষুধা একটি রোগ বিশেষ। রোগ হইলে যেমন ক্লেশ, বলক্ষয়, ও বিবর্ণতাদি জন্মে—ক্ষুধাও স্থায়ী হইলে সেইরূপ অর্থাৎ ক্লেশ, বলহানি এবং বিবর্ণতাদি জন্মাইয়া থাকে। এই ক্ষুধাস্বরূপ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ অন্ন। আর ব্যঞ্জনাদি তাহার অনুপান মাত্র। অতএব, ব্যঞ্জন যত ভাল হউক বা না হউক—অন্ন যাহাতে ভাল অর্থাৎ নির্দ্দোষ হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক। "ব্যঞ্জন অনুপান" তাই বলিয়া তাহাকে অযত্ন করিতে বলিতেছি না, অনুপানের গুণেও ঔষধের বীর্য্য বিশেষরূপে বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কাযে কাযেই অন্ন ও ব্যঞ্জন উভয়বিধ ভক্ষ্যেরই গুণ দোষ দেখা আবশ্যক; পরন্তু অন্ন ব্যঞ্জনের দোষ গুণ নির্ব্বাচন করা পাকবিদ্যা না জানিলে অসাধ্য হইয়া উঠে।

বল, বর্ণ, তেজ;—সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, অরোগিতা,—সমস্তই এমন কি জীবন পর্য্যন্ত যাবতীয় দৈহিককাণ্ড সমুদায়ই আহারের অধীন। এতাদৃশ আহারের ভার এ দেশে নারীজাতির উপরেই নির্ভররূপে স্থাপিত আছে। সুতরাং বালক, বালিকা, রুগ্ন, ভুগ্ন, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের জীবন নারীজাতির হস্তে বলিলেও বলা যায়। একারণ, আহারীয় বিষয়ে নারীদিগের বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। কিন্তু পাকবিদ্যা না জানিলে তদ্বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি উদ্রেকের সম্ভাবনা নাই।

যদিও আঢ্য-গৃহিনীগণের পাক করিতে হয় না, তথাপি, তাঁহাদেরও পাকবিদ্যায় মূর্খ থাকা উচিত নহে। বাটীর কর্ত্তা বা কর্ত্রী অজ্ঞ হইলে তদীয় ভৃত্যেরা যে সুচারুরূপে কার্য্য করে না, তাহা ব্যক্তিমাত্রেই বিদিত আছেন। কর্ত্রী যদি রন্ধন বিষয়ে সুশিক্ষিতা থাকেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় পাচক বা পাচিকার দ্বারা বিনা অপব্যয়ে ইচ্ছানুরূপ উত্তম উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া লইতে পারেন। অনভিজ্ঞা হইলে পাচক যাহা দিবে, তাহাই গৃহপালিত পক্ষিশাবকের ন্যায় হাঁ করিয়া খাইতে হইবে। অতএব কি ধনী, কি দরিদ্র. সকল শ্রেণীর নারীদিগেরই পাক-বিদ্যা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এদেশীয় প্রাচীন ইতিহাস পুস্তকে দেখা যায় যে, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজপত্নীরাও পাকবিদ্যায় নিপুণা ছিলেন, এবং বহুতর পাচক পাচিকা সত্ত্বেও তাঁহারা স্বয়ং ইচ্ছানুরূপ পাক করিয়া দাস দাসী ভৃত্য অমাত্য প্রভৃতিকে স্বহস্তে

ভোজন করাইতেন। পাণ্ডবপত্নী কৃষ্ণা, রামবনিতা সীতা, কৃষ্ণভার্য্যা রুক্মিণী, নল-ললনা দময়ন্তী প্রভৃতি রাজপত্নীরা তাহার দৃষ্টান্ত। ইদানীন্তন কালেও ভাস্কর-কন্যা লীলাবতী পাকবিদ্যায় বিলক্ষণ পণ্ডিতা হইয়াছিলেন। শুনা যায় যে, ইহাদের রচিত পাক-শাস্ত্র অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। মনে করিও না যে, পাকবিদ্যা আবার বিদ্যা! ইহা বিলক্ষণ উন্নতিশীল বিদ্যা। তোমরা যাহাকে রসায়নবিদ্যা বলিয়া জ্ঞাত আছ, ইহা তাহারই এক শাখা, অতএব ইহাকেও এক প্রকার রসায়ন বিদ্যা বলা যাইতে পারে। ইহা "পাক-বিজ্ঞান" বা "রান্ধনিক-রসায়ন" নামে উল্লেখ করিবার যোগ্য।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে এ পর্য্যন্ত একটীও স্ত্রী-কবির উল্লেখ করা হয় নাই। পাক-বিদ্যা যে সহজ নহে—তাহার উদাহরণ স্বরূপ স্ত্রী কবির একটী বচন প্রদত্ত হইল।

"রান্না বাড়না ঘরকন্না,
না জান্‌লে পায় কান্না।"

রান্না—রন্ধন। বাড়না—পরিবেশনাদি কার্য্য। ঘরকন্না।—গৃহধর্ম্ম। এ সমস্ত শিক্ষা না করিলে "কান্না" ক্রন্দন করিতে হয় অর্থাৎ অভ্যাস ও জ্ঞান না থাকিলে উহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা যায় না।

পাকবিদ্যা শিক্ষিত ও অভ্যস্ত থাকায় অপর কতকগুলি আনুষঙ্গিক ফল আছে, তাহা এইস্থানেই প্রদর্শিত হইতেছে। স্ত্রীজাতির শরীর ব্যায়াম যোগ্য নহে। নারীগণ যদি পুরুষের ন্যায় ব্যায়াম চর্চ্চা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের লাবণ্য হ্রাস ও শারীরিক মানসিক কোমলতা নাশ প্রভৃতি অনেক অগুণ উৎপন্ন হয়, তাঁহাদের স্কন্ধে উপার্জ্জনের ভার অধিক থাকে না যে তদুপলক্ষে কথঞ্চিৎ ব্যায়াম সদৃশ শ্রম করিতে হইবে। গৃহকর্ম্ম ও পাক ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন উপলক্ষে ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। অথচ ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম দেহধারীর পক্ষে অতীব আবশ্যক। এমন আবশ্যক উপকারী পদার্থ যাঁহারা আলস্যে গা ঢালিয়া পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা জগতে কতপ্রকার সুখ আছে তাহা কিছুই জানেন না, রোগীর ন্যায় কেবল শয্যা সুখই জানেন। যাহাইহউক, পাকবিষয় জানা থাকিলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কিছু না কিছু

ব্যায়াম চর্চ্চা হয়। ঘর্ম্ম হবে, কাপড়ে দাগ লাগিবে, চক্ষে ধূম লাগিবে, নবনীত গাত্রে অগ্নির উত্তাপ লাগিবে এ সকল আপত্তি অলস-প্রকৃতি নারীর এবং স্ত্রী 'ননীর পুতলী' শ্রম করিতে গেলে গলিয়া যাইবে এ কথা পুরুষের মুখ হইতেই উত্থিত হইয়াছে। ফলতঃ বিশেষরূপে পাকবিজ্ঞান জ্ঞাত হইলে তদ্দ্বারা নারীগণের আমোদ, প্রমোদ, ব্যায়াম, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি সকল উপকারই সাধিত হইবার সম্ভাবনা।

(ক্রমশঃ)

হৃদয়োচ্ছ্বাস।

ইংলণ্ডগামী কোন একটী বন্ধুকে অবলম্বন করিয়া এই কবিতাটী লিখিত হইল।

১

দীপিছে প্রচণ্ড শিখা জলন্ত অঙ্গারে,
উদ্গীরিয়া ধূমরাশি শৈলের আকার,
প্রচালক ক্ষিপ্রকরে অঙ্গুলি সঞ্চারে,
খুলিল বাষ্পের বেগ প্রবল দুর্ব্বার।

২

যন্ত্রেতে যন্ত্রেতে গতি প্রতি রন্ধ্রে তার
ছুটে যেন মেঘদল তাড়িত* তাড়িত,
জড়ের কায়ায় হল জীবন সঞ্চার
ভীষণ পরিধি চক্র বেগে বিঘূর্ণিত।

৩

ছুটিল বাষ্পীয় যান অতি দ্রুতগতি
সরিৎ সলিল রাশি করি খান্ খান্,
উত্থিত ধূমের-স্তম্ভ না লভি বিরতি,
আকুলিত করি এক মানবের প্রাণ।

---

* বিদ্যুৎ।

৪

তীরেতে দাঁড়ায়ে নর চিন্তায় বিধুর,
ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে আছে বাষ্পযান প্রতি,
উপেক্ষিয়া সে নরের দৃষ্টি তৃষাতুর,
ছুটিছে বাষ্পীয় যান তীরপক্ষ গতি।

৫

যানের উপরে এক যুবক রতন,
কৃষ্ণবর্ণ নাতিদীর্ঘ নাতিক্ষুদ্রকায়,
চাহিয়া তীরের পানে, সতৃষ্ণনয়ন,
সবিষাদে একখানি রুমাল উড়ায়।

৬

আহা সেই তীরগত মানবের মন
এসময় কতরূপ চিন্তায় ব্যথিত,
সেই জানে এইরূপে যদি কোন জন,
সমদুঃখে সমভাবে হয়েছে দুঃখিত।

৭

এই বাষ্পযানে যুবা ইংলণ্ড গমনে,
করিয়াছে যাত্রা, বহু শিক্ষা লাভ আশে,
দুঃখিনী জননী তার অতি ক্ষুণ্ণ মনে,
পড়ে আছে একস্থানে আঁধার আবাসে।

৮

পড়ে আছে একস্থানে আঁধার আবাসে,
কাঙ্গালিনী বেশে জায়া শোক-বিষাদিনী,
নিকটে তনয়া শিশু মৃদু মৃদু হাসে,
সেতো নাহি জানে কভু দুঃখের কাহিনী।

৯

সে কিবা জানিবে দুঃখ, আহা মাতা তার,
বিশুষ্কা কনক-লতা বিমলিন-কায়া,

পড়ে আছে শূন্য মনে করি চিন্তা সার,
সুষমার ছবিখানি সারল্যের ছায়া।

১০

বহুদিন হতে কান্ত শিখায়েছে তায়,
করিতে কঠোর প্রাণ—অটল, অচল,
কিন্তু উপদেশ গুলি আজি কেন হায়
বিশ্লথ হৃদয়ে তার নাহি দেয় বল ?

১১

সার কথা উপদেশ সুমিষ্ট বচন,
সাধিতে কঠিন কিন্তু কার্য্যের সময়,
অথবা বিপদে কভু হইলে পতন,
থাকে কি মনের তেজ, সবল হৃদয় ?

১২

তাহাতে অবলা নারী পরাধীনা প্রায়,
বুঝেও বুঝেনা কেবা করিবে সান্ত্বন ?
পুরুষে যে মনোবেগ সহা নাহি যায়,
রমণী কেমনে তাহা করিবে ধারণ !

১৩

ওগো পুত্রগত-প্রাণা তাপসি জননি !
শান্তির আশ্রয় মাতা করগো গ্রহণ,
অবশ্য আসিবে তব পুত্র গুণমণি,
বিষাদ-রজনী তব রবে না তখন।

১৪

ওগো বিমলিনা সতি ! বিশ্লথ হৃদয়,
ভাবনা-সাগরে তুমি পাবেনাক কূল,
পরিতাপাতপ, অতি তীব্র তেজোময়,
এ আতপে শুষ্ক হয় জীবন-মুকুল।

১৫

তাই বলি উঠ মাতঃ! পুত্রবধূ সনে,
গৃহকার্য্যে দেহ মন, দিবা অবসান,
খসিল একটী দিন পুত্রের মিলনে,
দিন দিন যাবে দিন, তিল পরিমাণ।

১৬

দিনে দিনে দিন গত, মাস গত আর,
ছমাস, ছমাস, পরে বিগত বৎসর,
ক্রমে নিরখিবে মাতঃ আসা পথ তার,
গৃহে প্রত্যাগত হবে তনয় তোমার।

১৭

ওহে বিশ্বেশ্বর বিধি কর অতঃপর
এই দুঃখী পরিবারে সান্ত্বনা বিধান,
গৃহে প্রত্যাগত পুনঃ হউক সত্বর,
এ গৃহের গৃহস্বামী তব সুসন্তান।

দেশভ্রমণ।

কাঁথী।

কাঁথীর নিকট সমুদ্রতীরে বাঁধ নির্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের একটী অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। ইতিপূর্ব্বে সমুদ্রতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া তীরস্থ ভূমিখণ্ড সকলকে প্লাবিত করিত, লবণাক্ত জলে চাষ বাস নষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু এই বাঁধ হইয়া অবধি প্লাবন নিবারণ হইয়াছে, অতিবৃষ্টিহেতু অধিক জল জমিলে তাহা কবাটী কলদ্বারা বাহির করিবারও সুবিধা হইয়াছে। ইহাতে স্থানীয় কৃষি-কার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট নিকটস্থ জমিদারদিগকে অতি স্বল্পহারে হিজলী অঞ্চল বিলী করিয়াছিলেন, কিন্তু সমুদ্রজলে ফসলের পুনঃ পুনঃ হানি হওয়াতে তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া জমি ছাড়িয়া দেন এবং তাহা

গবর্ণমেণ্টের খাসমহলে পরিণত হয়। সরকার হইতে বাঁধ নির্ম্মিত হইয়া এই খাসমহল বিলক্ষণ উর্ব্বর ও লাভকর হইয়াছে। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের রাজস্ববৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টাপর হইয়াছেন। ২০। ২৫ হাজার প্রজার বিরুদ্ধে খাজনা বৃদ্ধির অভিযোগ হয়, প্রজারা সমবেত হইয়া আত্ম-পক্ষ সমর্থনেরও উপায় অবলম্বন করে। তাহারা চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা হইতে বারিষ্টার লইয়া যায়। যদিও অধিকাংশ স্থলে প্রজাগণের বিরুদ্ধে মীমাংসা হইয়াছে, তাহারা এককালে বিফল—মনোরথ হয় নাই এবং মুন্সেফ আদালতের বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যখন অপর জমীদারদিগকে প্রজাশাসনের উপদেশ দিয়া থাকেন, তখন নিজে জমীদার স্থানীয় হইয়া খাসমহলের প্রজাদিগের প্রতি যতদূর সাধ্য সদয় ব্যবহার করিবেন, ইহা অবশ্যই আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি। সত্যবটে বাঁধ নির্ম্মাণে গবর্ণমেণ্টের অনেক ব্যয় হইয়াছে, এবং ইহা দ্বারা ভূমির উন্নতি হইয়া যখন প্রজাগণ লাভবান হইয়াছে, তখন লাভের কিয়দংশ রাজপদে অর্পণ করা তাহাদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহাদিগের পক্ষে সহ্য হয়, ক্রমশঃ এইরূপ আয়োপায় অবলম্বন করা রাজার বিধেয়। বাঁধ নির্ম্মিত হইয়া প্রজাদিগের পক্ষে কেবলই যে সুফল লাভ হইয়াছে তাহা নহে, বৃষ্টির আধিক্য হইলে জল শীঘ্র নির্গত হইতে পারে না, ইহাতেও প্রজাদিগের শস্য ও গৃহাদির অনিষ্ট করিয়া থাকে। বাঁধ না থাকিলে জল অবিলম্বে সমুদ্রে গিয়া পড়িত। বাঁধদ্বারা আর একটী সাধারণ অনিষ্ট এই হইয়াছে, যে ইহাদ্বারা বাধা পাইয়া সমুদ্রের জল এক দিকে যেমন উঠিতে পারে না, সেইরূপ অধিকতর বেগে অন্য দিকে প্রবাহিত হইয়া তদঞ্চলের ভূমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্লাবিত ও ভগ্ন করিতেছে। কালে ইহাদ্বারা অনেক ভূমি জলধিসাৎ হইবে।

সমুদ্রের বাঁধ অতি উন্নত ও প্রশস্ত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা যে শীঘ্র ভগ্ন হইবে এরূপ সম্ভাবনা নাই। বাঁধের স্থানে স্থানে জল নির্গমের উপায় আছে। একটী স্থানে এই জল নির্গম সেতু অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য। শুনা যায় পৃথিবীতে ইহার তুলনা স্থল কেবল আর একটী আছে, তাহা আমেরিকাতে, তাহার নিম্নে ইহাকে গণনা করা যায়।

কাঁথী অঞ্চলে অত্যন্ত কুমীরের প্রাদুর্ভাব। কুমীর সমুদ্রের লোণাজলে দৃষ্ট হয় না। কালীনগরের নিকটস্থ কালীনদীতে ইহা এত সংখ্যক বাস করে, যে লোকে তাহার জলস্পর্শ করিতে ভয় পায়। জলে নামিলেই তৎকর্তৃক আক্রান্ত হইতে হয়। ইহার নিকটে স্থানে স্থানে জঙ্গল আছে, তাহাতে ব্যাঘ্রের ভয়ও বিলক্ষণ আছে।

কাঁথী হইতে গেঙ্গোখালীতে আসিবার পথে মহিষাদল। ইহা একটী দর্শনীয় স্থান এবং নগর নামে উক্ত হইতে পারে। ইহার বাজারে অনেক-গুলি দোকান দৃষ্ট হইল এবং প্রায় সকল প্রকার খাদ্য তথায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহিষাদলের রাজবাটী যাইতে হইলে একটী অতি উচ্চ সুন্দর ও বৃহৎ সেতু পার হইয়া যাইতে হয়, ইহা তত্রত্য একটী প্রধান কীর্ত্তি, রাজ-সরকারের অনেক অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। সেতু পার হইয়া রাজকীয় পথে প্রবেশ করিয়া প্রথমে একটী হস্তিশালা দেখা যায়, তথায় একটী বৃহৎকায় হস্তী দৃষ্ট হইল। তৎপরে একটী সুন্দর অট্টালিকা, ইহা অনেকটা ইংরাজী ফ্যাসনের এবং ভূতপূর্ব্ব রাজার বৈঠকখানা ছিল, এক্ষণে কোর্ট অব ওয়ার্ডের সাহেবের কুঠী হইয়াছে। ইহার পার্শ্বে কয়েকটী পাকাগৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। কুঠী পার হইয়া গিয়া দেবালয়ে উপস্থিত হওয়া যায়। দেবমন্দিরটী সুন্দর ও দৃঢ়রূপে গঠিত। দেবালয় হইতে কিয়দ্দূর গিয়া রাজপ্রাসাদ নয়নগোচর হয়। ইহা দেখিয়া বড় শ্রদ্ধার উদয় হইল না। বাঙ্গালিদিগের অন্দরমহল যেরূপ সঙ্কীর্ণ ও মলিন, ইহাও প্রায় সেইরূপ দেখা গেল। মহিষাদলের ভূতপূর্ব্ব রাজা বাল্যকালে সন্ন্যাসী ছিলেন, ভাগ্যক্রমে রাজাধিকারী হন। শুনা যায় এই রাজবংশের কোন উত্তরাধিকারী ছিল না, বালক সন্ন্যাসী রাজবাটীতে অতিথি হইলে পরিচয়ে জানা যায়, তিনি পশ্চিমদেশীয় এবং এই রাজকুলের জ্ঞাতি; ইহাতেই তাঁহাকে রাজা করা হয়। তাঁহার মহিষী রাণী নিস্তারিণী দানশীলতা ও সৎকার্য্যে উৎসাহিতার জন্য অনেক স্থানে বিখ্যাত হইয়াছেন। রাণীর তিনটী নাবালক পুত্র আছেন। তাঁহারা এতদিন কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে কলিকাতায় থাকিয়া লেখা পড়া করিতেছিলেন, ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউসন উঠিয়া যাওয়াতে ইহাদিগের পাঠের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতেছে।

সরোজ।

সরোজ মাতৃহীন। তাহার সুকুমার গোলাপ কান্তি হৃদয়ের পবিত্র স্বর্গীয় ভাবের উদ্দীপক। তাহার চক্ষুর্দ্বয়ের স্নিগ্ধ দীপ্তি সুমধুর ও কোমল।

যে গৃহে সরোজ বাস করে তাহা সুসজ্জিত, বিবিধ মূল্যবান সামগ্রীতে সুশোভিত। গৃহতল মহামূল্য গালিচায় মণ্ডিত। প্রাচীর সকল অশেষ প্রকার মনোহর ছবি দ্বারা বিভূষিত। যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, কারু-কার্য্যের অভাব নাই।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি সরোজ মাতৃহীন। ইহা কি সত্য? ঐ যে রমণী দেখিতেছি উনি কে? সরোজের প্রবাল ওষ্ঠ, আরক্ত লোচন, সুগঠন দেহ সকলেতেই যে ইঁহার সাদৃশ্য, ইঁহার প্রতি যতদৃষ্টি কর ততই নূতন সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়। প্রকৃতির অপরিমেয় দানে এই রমণী অলঙ্কৃত, সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষে সকলেই ইঁহার নিকট ম্লান। জ্ঞানে কয় জন ইঁহার সমকক্ষ? এ প্রকার জননী কয় জনের? কিন্তু তথাপি আমরা বলি সরোজ মাতৃহীন, কারণ ঐ রমণীর সকল থাকিয়াও একটী বিষয়ের অভাব ছিল। প্রকৃতি সমুদয় বিধান করিয়া একটী বিষয়ে অপূর্ণ রাখিয়া ছিলেন—সরোজের মাতা ধার্ম্মিকা ছিলেন না।

সত্যই কি তিনি সরোজের প্রতি স্নেহশূন্যা? স্বীয় শিশু সম্বন্ধে উদাসীন? তাহা নহে। সরোজের সুন্দর শ্রী মাতার যত্নে অধিক মনোহর ভাব ধারণ করিত। কখনই তিনি তাহার সেই কোমল চিক্কণ কেশগুচ্ছ পরিষ্কার করিতে অমনোযোগী হইতেন না। বলিতে কি কন্যার বেশ, ভূষা, অলঙ্কার এ সকল বিষয়ে কথন তাঁহার ঔদাসীন্য ছিল না, বরং তিনি এসকল সম্বন্ধে বিশেষ তৎপর, সমধিক উদ্বিগ্ন। ধনের প্রাচুর্য্য, মাতার যত্ন, দাস দাসী—সরোজের সকলই আছে—তবুও বালিকা মাতৃহীন। ঐ দেখ বালিকা উচ্চ প্রাসাদের গবাক্ষ দ্বারে দণ্ডায়মান, মুখখানি ম্লান, কোমল শ্বেতহস্ত কেশদামে স্থাপিত, চক্ষু দুইটী আস্বাভাবিক উজ্জ্বল, কপোলদেশ

কখনও শ্বেত—কখনও আরক্তিম। একদৃষ্টে অপরাহ্নের পশ্চিমাকাশের প্রতি চাহিয়া আছে নভোমণ্ডলের প্রত্যেক শোভা হৃদয়কে বিকম্পিত ও স্তম্ভিত করিতেছে। চকিতের ন্যায় বালিকার দৃষ্টি প্রকৃতির শোভাতেই ন্যস্ত। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে মাত্র। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা শোভা বিলীন হইল। অন্ধকার এবং তৎসঙ্গে আকাশ পটে দুই একটী নক্ষত্র দেখা দিল।

নির্দ্দোষ বালিকা জানে না কেন তাহার হৃদয় কোন অভূত আনন্দে পূর্ণ—চক্ষুর্জল তার স্তম্ভিত—অনেকক্ষণ এইরূপে গেল। হঠাৎ তাহার ভাই পশ্চাতে আসিয়া বলিল "সরোজ! তোমার একা থাকিতে ভয় করে না? সন্ধ্যা হইয়াছে, মা ডাকিতেছেন চল গাড়ী প্রস্তুত, আমরা বেড়াইতে যাইব; এতক্ষণ আমাদের যাওয়া হইত, কিন্তু তোমার জন্যই এত দেরী হইল।"— বালিকা চমকিয়া উঠিল, সে এক দৃষ্টিতে আকাশের শোভা, নক্ষত্রের দীপ্তি দেখিতেছিল, ভ্রাতার কথা কর্ণেও গেল না, মুগ্ধের ন্যায় চাহিয়াই রহিল এবং ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "দাদা! মাসীমা বলিতেন আমরা কখন একা থাকি না, যেথানেই যাই, যে ঘরেই থাকি, পরমেশ্বর আমাদের কাছে থাকেন, আর মাসীমার কাছে ইহাও শুনিয়াছি যে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি দেখা দেন।" নক্ষত্র শোভিত নীলাকাশের প্রতি চাহিয়া আবার বলিল "দাদা! আমার বড় ইচ্ছা করে আমিও ঐখানে যাই; কারণ এ কথা মাসীমাকে বলিতে শুনিয়াছিলাম যে ঈশ্বর ঐখানে থাকেন এবং আমাদের মত ছোট ছেলেকে ভাল বাসেন। মাসীমাও কি তাঁর কাছে গিয়াছেন? আমার খুব ইচ্ছা করে আমার মাসীমাকে দেখি, তাঁর কথা শুনি, তিনি যে সকল কথা বলিতেন এখন আর কেহ আমাকে তেমন সব কথা বলে না।" যে ভাবে শিশুর মুখ হইতে এইবাক্য গুলি উচ্চারিত হইল, তাহাতে তাহার বালক ভ্রাতাও অবাক্ হইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সরোজের চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল এবং সে অধিকতর আগ্রহের সহিত নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্রমশঃ

নূতন সংবাদ।

১। লণ্ডনের 'কিংস কলেজ' বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সভা স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার উন্নতি বিধান করিবেন, স্থির করিয়াছেন।

২। অল্প দিন মধ্যে অনেক স্থানে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জাপানে এক ভূমিকম্প হইয়া তত্রত্য এক পাহাড় দোফাঁক হইয়া তাহার মধ্য হইতে এক জলপ্রপাত উৎপন্ন হইয়াছে! আমেরিকার হেটাইতে প্রবল ঝটিকা সহ এক ভূমিকম্প হয়, তাহাতে পাহাড়ের অংশ সকল ভাঙ্গিয়াছে এবং অনেক পশুর মৃত্যু হইয়াছে। তুরুস্কের আর্ম্মেয়িণা প্রদেশে এক ভূমিকম্প হইয়া ভান হ্রদের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ৩৪টী গ্রাম এককালে ধ্বংস হইয়াছে ও অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। যাহারা জীবিত আছে, তাহারা নিরাশ্রয় হইয়া পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের দুর্দ্দশার অবধি নাই।

৩। পরলোক গত রঘুনাথ জনার্দ্দনের পত্নী লক্ষ্মীবাই পুনা বিজ্ঞান কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিঙ্ বিদ্যার অনেক গুলি মূল্যবান্ পুস্তক প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

পারিবারিক ঘটনা।

৪। গত ১৫ই শ্রাবণ (২৯এ জুলাই) শুক্রবার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা গৃহে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর কন্যা শ্রীমতী লীলাবতীর সহিত ময়মন সিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্রের শুভবিবাহ কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে ও সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

পুস্তকপ্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। প্রাকৃতিক ভূ-বিবরণ—শ্রীগৌরকিশোর কর বি,এ, প্রণীত বসুপ্রেসে, মুদ্রিত, মূল্য ।/০ আনা। প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ে আর দুই তিন খানি গ্রন্থ থাকিলেও এখানি স্বল্পমূল্য এবং সহজ ভাষায় লিখিত। ইহা ছাত্রদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

২। মানস কুসুম—শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।৶০ আনা। সিরাজসমাধি, রাধাকৃষ্ণ, জয়দ্রথ বধ, ভারতের বিলাপ ইত্যাদি ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি নানা বিষয় পদ্যচ্ছন্দে লিখিত] হইয়াছে। কবিতাগুলি অধিকাংশ মন্দ হয় নাই, কোন কোনটী বেশ সুন্দর হইয়াছে।

৩। রাজপুর বান্ধব পুস্তকালয়ের চতুর্থ সাংবৎসরিক বিবরণ—এই পুস্তকালয়ে প্রায় সহস্র খণ্ড পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা চারি বৎসর কাল চলিয়াছে এবং কয়টী সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি ইহার অধ্যক্ষতা করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমরা ইহার স্থায়িত্বের আশা করিতে পারি। রাজপুরের ন্যায় ভদ্রপ্রধান স্থানে একটী পুস্তকালয় দ্বারা যে জ্ঞানালোচনার বিশেষ সাহায্য হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

বামাগণের রচনা।

সুখ—মনের প্রতি।

হায়রে অবোধ মন—
নিয়ত ব্যাকুল তুমি সুখের লাগিয়ে,
ভ্রমিছউন্মত্ত প্রায় বল কি বুঝিয়ে,
কি সুখ সংসারে মন, ভুলিয়ে জীবন ধন?
মরুভূমে জল আশা কর কি কারণ?
ভাঙ্গিবে না তৃষা তব বৃথা আকিঞ্চন! ১

কেমন পাগল তুমি!—
বৃথা চিন্তা সুখ আশা ভুলি সেই জনে,
শান্তি কভু দিতে পারে যশঃ মান ধনে?
সুখ সুখ করি মন, ব্যস্ত তুমি অনুক্ষণ,
কিন্তুরে জান না তুমি সুখের উপায়,
ধর্ম্মহীন জনে সুখ আছেরে কোথায়? ২

ধরম রতন ত্যজি—

বিমল সুখের আশে করিলে ভ্রমণ,
তাহাতে কি আছে লাভ ও অবোধ মন।
পাপেতে মলিন হয়ে,　　অশেষ যাতনা সয়ে,
নিজ দোষে সুখ সঙ্গে নাহিক দর্শন,
অমৃত ত্যজিয়া কর গরল ভোজন !!　৩

আজো মনঃ চিনিলে না—

বিশাল জগৎ মাঝে কে হয় আপন,
ইহ পরকালে হয় বন্ধু কোন্ জন ?
পাপেতে কাতর হলে,　　কে লয় তখন কোলে,
পাপ হৃদে শান্তি বারি কে সিঞ্চন করে,
অনল সমান জ্বালা বল কে নিবারে ?　৪

অনিত্যে মজিলে হায়—

কি হবে উপায় মন ! ভাব একবার,
এই রূপে দিন কিছু যাবে না তোমার,
শেষের সময় মন,　　কেন না কর স্মরণ,
সেই দিনে কে রাখিবে বল না তোমায় ?
কে হইবে সঙ্গী তব কে হবে সহায় ?　৫

কে আছে এমন বল,—

ভয়ঙ্কর সেই দিনে দিবে হে অভয়,
হেন প্রিয়তম তব কে আছে ? হৃদয়,
এখন দেখিছ মন,　　আছেরে অনেক জন,
কিন্তু সেই দিনে বল কেবা কোথা আর,
ফুরালে ভবের খেলা, অন্য ব্যবহার।　৬

অবোধ হৃদয় দেখ—

জীবন হইলে গত কি সম্বন্ধ তবে,
তুমি আমি এ বন্ধন ছিন্ন হবে ভবে,

তুমি হে রয়েছ যার, যে জন হয় তোমার,
ঘুচিবে সম্বন্ধ হায়, 'তোমার' 'আমার'
ফুরাবে এ কথা হবে সব শূন্যাকার, ! ৭
সকলি স্বপন প্রায়—
সহে না যাহাতে ক্লেশ তিল অত্যাচার,
ভাবরে চরমে দশা কি হবে তাহার,
পরের কথায় হেন, বজ্রাঘাত হয় যেন,
রাগ, অভিমানে মত্ত আছ সর্ব্বক্ষণ,
হৃদয় ! স্বভাব তব কেমন ! কেমন ! ৮
বুঝালে বুঝ না মন—
কিসের লাগিয়ে কর এত অহঙ্কার,
কি কারণে এত দম্ভ, গৌরব তোমার,
আপন মঙ্গল মন, কেন না কর চিন্তন,
থাকিতে নয়ন তুমি, হলে অন্ধপ্রায়,
আপনি না চিন্ত কেন আপন উপায় ? ৯
সময় থাকিতে মনঃ—
ভাব সেই প্রেমময়ে প্রেমের সাগরে
সহায় যেজন তব চিরদিন তরে,
ক্ষণস্থায়ী সুখ লাগি, চিরদিন তরে ভুগি,
অনন্ত কালের সুখ না কর সঞ্চয়,
দুদিনের তরে আর ভুলনা হৃদয়। ১০
কোথায় পাপীর বন্ধু !—
পাপে কলুষিত নাথ হৃদয় আমার,
তোমা বিনা এ যাতনা কে দেখিবে আর ?
পাপ অনলেতে মন, জ্বলিতেছে অনুক্ষণ,
নিবাওহে পাপনল কৃপাজল দিয়ে,
জুড়াক সকল জ্বালা শান্তি পাক হিয়ে। ১১
হরিমতি।

65

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২০০ সংখ্যা। } ভাদ্র ১২৮৮—সেপ্টেম্বর ১৮৮১। { ২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম লাহোরে একটী বিধবাবিবাহ সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ, হিন্দুসমাজ ও শিখসমাজ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহার সভ্য হইয়াছেন। সুবিজ্ঞ দেশহিতৈষী বাবু নবীনচন্দ্র রায় যিনি অনেক দিন হইতে অর্থব্যয় ও বিপুল পরিশ্রম-সহকারে বিধবাবিবাহের সহায়তা করিয়া আসিতেছেন, তিনি ইহার প্রধান উদ্যোগী এবং এই সভার প্রধান সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। যে সকল বিধবা বিবাহার্থিনী এবং যে সকল পুরুষ বিধবা বিবাহার্থী, এই সভা হইতে তাহাদিগের নামের তালিকা সংগ্রহ হইবে এবং পরে যোগ্য বিবেচনায় পরস্পরের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। পঞ্জাব, মান্দ্রাজ, বোম্বাই সর্ব্ব স্থানেই হতভাগ্য হিন্দু বিধবাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে, বঙ্গদেশ কেবল কি নীরব থাকিবে? বঙ্গদেশে একটী বিধবা-বিবাহ সাহায্যকারী সভা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদি তাহা না হয়, সহৃদয় বঙ্গবাসীগণ পঞ্জাবসভার সহিত যোগ দিয়া কার্য্য করুন, উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইতে পারিবে।

যে ইংরাজ জাতি নারীগণকে উচ্চতর সম্মান দান করিয়া আপনাদিগের সভ্যতার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরই মধ্যে নারীজাতির প্রতি ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিবার কুপ্রথা রহিয়াছে ইহা কি লজ্জা ও ঘৃণার কথা! পত্নীকে প্রহার করা এই কুপ্রথা। লণ্ডনের 'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্র লিখিয়াছেন, এক সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ের জন্য অনেক গুলি অভিযোগ হইয়াছে এবং অত্যাচারী স্বামীদিগের দোষ সপ্রমাণ হইয়া ২। ৩ মাস করিয়া কারাবাস দণ্ড হইয়াছে। এই অত্যাচার গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া উক্ত পত্র ইহা নিবারণার্থ একটী স্বতন্ত্র আইন করিবার আবশ্যকতা দেখাইয়াছেন। যে দেশে হউক, এরূপ পশুবৎ আচরণের বিশেষ শাসন হওয়া একান্ত আবশ্যক তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা যতদূর জানি বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগত সহধর্ম্মিণী রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গ রমণীদিগের মধ্যে প্রথম বিলাতে পদার্পণ করেন, তৎপরে কয়েকটী বঙ্গবালা তথায় গমন করিয়াছেন। আজি কালি, বিলাতগামী স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিলাতকে এক প্রকার ঘর করিয়াছেন এবং তথা হইতে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছেন। আমরা আশা করি ইংলণ্ডগামিনী বঙ্গাঙ্গনাগণ তত্রত্য সুনীতি সুপ্রথা ও সদ্‌গুণ সকল শিক্ষা করিয়া স্বদেশীয়াদিগের মধ্যে সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও তাহাদের দুরবস্থা মোচনের সহায়তা করিবেন।

আমাদিগের রাজ্যেশ্বরী মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া অবসর পাইলেই ভারতবর্ষের প্রতি স্নেহ নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন ইহা অতিশয় আনন্দের বিষয়। ইতিপূর্ব্বে কয়েকটী দেশহিতৈষী ভারতসন্তানকে তাঁহার সহিত দেখা ও সম্ভাষণ করিতে দিয়াছেন। বিলাতস্থ কোন কোন ভারতকন্যা তাঁহার গৃহে প্রকাশ্যরূপে নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। সম্প্রতি মিস্ বিবলী নাম্নী একটী বিবি লক্ষ্ণৌ হইতে বিলাতে গিয়াছেন, মহারাণী তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া এ দেশের অন্তঃপুরের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক বিষয় ঔৎসুক্য

সহকারে শ্রবণ করিয়াছেন। মহারাণীর এরূপ সহৃদয়তার কথা শ্রবণ করিয়া কে না প্রীত হইবেন?

বামাবোধিনীর ঊনবিংশ জন্মোৎসব।

বামাবোধিনী অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ঊনবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। আজি বামাবোধিনীর হিতৈষী বন্ধুগণ আমাদিগের সহিত এক-হৃদয় হইয়া ইহার কল্যাণ প্রার্থনা করুন। সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় পরমেশ্বর, যিনি দুর্ভাগিনী বঙ্গ-বালাগণের একমাত্র সহায়, যিনি তাহাদিগের সেবার জন্য এই বামাবোধিনীকে উদিত করিলেন, বার বার মৃত্যুমুখ হইতে ইহাকে রক্ষা করিলেন এবং সকল বিপদ বিঘ্নের মধ্যে তাঁহার মঙ্গল ছায়াতে ইহার ক্ষুদ্র জীবনকে রক্ষা করিয়া তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা সাধনে ইহাকে প্রবর্ত্তিত রাখিয়াছেন, আজি আমরা সমুদায় হৃদয় মন ও প্রাণের সহিত তাঁহার চরণে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করি। কৃপাসিন্ধু এই পত্রিকাকে আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহার কৃপায় ইহা যেন দীর্ঘজীবিনী হয়; ইহার প্রতি ইহার হিতার্থী বন্ধুগণের শুভ ইচ্ছা যেন চিরকাল বিদ্যমান থাকে, যাহা-দিগের কল্যাণ একমাত্র সঙ্কল্প করিয়া ইহার জীবন ধারণ, সেই সোদরো-পমা কোমলহৃদয়া বঙ্গনারীগণের স্নেহ ও ভালবাসা যেন ইহার প্রতি দিন দিন বর্দ্ধিত হয় এবং এই পত্রিকা যেরূপ আপনার কর্ত্তব্য সাধনের অতি প্রশস্ত ক্ষেত্র লাভ করিয়াছে, সেইরূপ উৎসাহ, যত্ন ও অনুরাগ সহকারে যেন আপনার কর্ত্তব্য সাধনে দিন দিন অধিকতর উপযুক্ত ও সমর্থ হইতে পারে।

আজি বামাবোধিনীর জন্ম দিনে আমরা কিছু আনন্দের চিন্তা করিব। বামাবোধিনী যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন সমাজের অবস্থা এক প্রকার ছিল, এখন অনেক অংশে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তখন আমরা যে আশা মনে ধারণ করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, ঈশ্বর প্রসাদে তাহা অনেক পরিমাণে পূর্ণ হইতেছে, এবং সেই সঙ্গে নবতর উন্নততর আশা আমাদিগের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতেছে। কন্যাগণকে শিক্ষা দান

করা অন্যায় ও অনাবশ্যক, এক সময়ে এই কুসংস্কার দেশব্যাপী ছিল, এখন আমরা আনন্দের সহিত দেখিতেছি, প্রায় প্রত্যেক নগর ও গ্রামে বালিকা-দিগের শিক্ষা বিধানার্থ সদুপায় হইতেছে এবং অনেক স্থলে পিতা মাতারা যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। অনেক শিক্ষিত পতি এখন গৃহে পত্নীর জ্ঞানোন্নতি সাধনার্থ শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া বা স্বয়ং শিক্ষক হইয়া অথবা পুস্তক ও পত্রিকা পাঠের সাহায্য করিয়া তাঁহাকে আপনার সঙ্গিনীর উপযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অনেক বালিকা এখন প্রকাশ্য পরীক্ষায় বালক-দিগের সহিত প্রশংসিত রূপে প্রতিযোগিতা করিতেছেন, অনেক রমণী সৎ প্রস্তাব লিখিয়া এবং গ্রন্থ-রচয়িত্রী হইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য হইতেছেন। বঙ্গনারীগণ আপনাদিগের উন্নতি জন্য স্থানে স্থানে সভা করিয়া সম্মিলিত ভাবে আপনাদিগের ও সমাজের হিত-সাধনে চেষ্টিত হইয়াছেন। অনেকে ইউরোপীয় মহিলাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এমত সাহসবতী রমণী সকলও দৃষ্ট হইতেছে, যাঁহারা পতি সমভিব্যাহারে বা স্বাধীন ভাবে সুদূর ইংলণ্ড ভূমিতে বিচরণ করিয়া জ্ঞান ও সভ্যতা উপার্জ্জনে উৎসুক হইয়াছেন। নারীগণ অনেক স্থলে উপযুক্ত বয়সে যোগ্য পতির পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার জীবন সঙ্গিনী হইতেছেন। দুঃখিনী বালবিধবাগণ পুনরায় পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া দুঃখের জীবনে সুখ লাভ করিতেছেন। নারীজাতি সম্বন্ধে অনেকের যে কুসংস্কার ছিল তাহা দূর হইয়া তাহাদিগের প্রকৃত উন্নতির জন্য অনেকের বাসনা ও চেষ্টা হইয়াছে। আমরা যে সকল উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম, এ সকল যদিও বালুকারণ্যস্থ মরুদ্বীপের ন্যায় অতি বিরল, এবং তাহা অনেকস্থলে সমাজ সংস্কারকদিগের সঙ্কীর্ণ-শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ, তথাপি ইহা দেখিয়া বামাহিতার্থীর হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। যাহা এক সময় স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তাহা এখন প্রত্যক্ষ করিয়া মনের আশা শত-গুণ বর্দ্ধিত হইতেছে। আজি এই আশা ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, তিনি এ দেশের নারীগণের সৌভাগ্যের যে উষা প্রভাত করিয়াছেন, তাহা উজ্জ্বল করিয়া দিন, বঙ্গসমাজ হইতে সমুদায় অন্ধকার দূর হউক, নারীগণের অজ্ঞানতা, কুআচার ও অধীনতা-বন্ধন মুক্ত

হউক, উন্নত নারী-চরিত্র ও নারী-জীবন ভারতে পুনঃ প্রকাশিত হইয়া ইহার গৌরব ও চির সৌভাগ্যের কারণ হউক।

মানুষ কত দিন বাঁচে?

পৃথিবীর আর আর সকল জীব অপেক্ষা মনুষ্য যেমন বুদ্ধি ও ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ, তেমনি তাহাদিগের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী। বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যের জীবনসীমা ১০০ বৎসর নির্ণীত হইয়াছে। সকল জাতির পুরাণে মনুষ্যের সহস্র, দশ সহস্র বা লক্ষ বৎসর জীবন ধারণের কথা লিখিত আছে এবং ব্যক্তি বিশেষ অমর বলিয়াও বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহা যে কল্পিত ও অসম্ভব ইহা বলা বাহুল্য। মনুষ্যের শরীরের গঠন প্রণালী যেরূপ এবং বাহ্য প্রকৃতির সহিত তাহার যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে শরীররূপ কল অধিক কাল চলিতে পারে না। কিছুকাল ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরে হ্রাস ও ভগ্ন হইয়া যাইবে, ইহা স্বভাবের অলঙ্ঘ্য নিয়ম।

প্রাচীনকালের লোকের যে দীর্ঘ জীবনের প্রবাদ বর্ণিত আছে, তাহা অনেক স্থলে বুঝিবার ভ্রমবশতঃ ঘটিয়াছে। পুরাকালের অনেক জাতির সময় নিরূপণের কোন উপায় ছিল না, সুতরাং অনুমান সিদ্ধান্ত যতদূর সত্য হইতে পারে, তাঁহাদের গণনা ততদূর সত্য। অনেক জাতি এক এক বংশ যতকাল বিদ্যমান থাকিত, তাহার আদিপুরুষের বয়স তত বলিয়া বর্ণনা করিত। অদ্যাপি আরবদিগের মধ্যে এই প্রথা বর্ত্তমান দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বকালে চান্দ্র-মাস দ্বারা বা অন্য রূপে বৎসর গণনা হইত, সৌর মাসে তাহা ধরিয়া লইলে সময় অনেক কমিয়া যাইবে। তবে আদিম অবস্থায় লোকে যখন স্বভাবের নিয়মে অধিক চলিত, তখন বর্ত্তমান সময়ের অপেক্ষা অধিক সুস্থ ও পূর্ণবয়স্ক হইত, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে।

প্লিনী নামক এক ভ্রমণকারী পণ্ডিত বলেন, বালুকারণ্যবাসী আরবেরা ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। পৃথিবী পর্য্যটনকারী হম্‌বোল্‌ড বলেন আমেরিকার আদিমবাসীরা সচরাচর ১০০ বৎসর এবং তাহার অধিকও

বাঁচিয়া থাকে। তিনি কতকগুলি বয়সের তালিকা দেন, তাহাতে ১৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত মনুষ্য বাঁচিয়াছে দেখা যায়। রুসিয়াতে অনেক দীর্ঘজীবী লোকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করা যায়। তত্রত্য এক ধর্ম্মসমাজ ১৮২১ সালের বিবরণে প্রকাশ করিয়াছেন কেবল গ্রীকধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের মধ্যেই ৮৪৮ জন শতাধিক বৎসর বাঁচিয়াছে, তন্মধ্যে ৩২ জন ১২৯, ৪ জন ১৩০ হইতে ১৩৫ বৎসরে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। ১৮২৬ সালের গণনানুসারে এক জন ১৬০ বৎসর বাঁচিয়াছিল।

আফ্রিকার তীরবর্ত্তী কৃষ্ণবর্ণ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পায়ু বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহারা ৪৫ বৎসরে বৃদ্ধ হয়। কিন্তু আফ্রিকার অভ্যন্তর দেশবাসীরা শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। বর্চেল বলেন হটেনটট জাতিরা শতাধিক বৎসর বাঁচে। আমেরিকার পশ্চিম ভারত-দ্বীপস্থ দাসেরা ১৩০ হইতে ১৫০ বৎসর বাঁচে, ইহা কিছু আশ্চর্য্য।

মনুষ্যের শৈশবাবস্থায় অধিক মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহার কারণ তৎকালের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জীবন ধারণের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে এবং তৎকালের পীড়া ঠিক্ বুঝাইয়া বলিতে পারা যায় না। যত সন্তান জন্মে, তাহার অর্দ্ধেক ২৬ এবং দশ আনা ৫০ বৎসরের পূর্ব্বে মরিয়া যায়। তের আনা ৭০ এবং ১৫ আনা ৮০ বৎসরের পূর্ব্বে মরে। সচরাচর ৯০ বৎসরের মধ্যে অবশিষ্ট এক আনা ফুরাইয়া যায়, এক আধটী গড়াইয়া গড়াইয়া ১০০ বৎসর বা তাহার কিছু অধিক বাঁচে। ৮০ বৎসরের পর জীবন ভোগের বিষয় না হইয়া কর্ম্ম-ভোগের কারণ হয়। তখন ইন্দ্রিয় সকল ক্ষীণ, ধমনী অসাড়, মাংসপেশী ও অন্যান্য কোমল শরীরাংশ কঠিন, মস্তিষ্ক অস্থীভূত হইয়া যায়। তখন স্মরণশক্তি হ্রাস হইয়া ভীমরতি উপস্থিত হয়। তখন জীবন মৃত্যুর ছায়ামাত্র।

এক জন শারীরবিদ্ পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছেন, বালক বালিকা ১ লক্ষ জন্মিলে এক মাস বয়সে ৯০,৩৯৩ হয় অর্থাৎ দশাংশের একাংশ কমিয়া যায়, দ্বিতীয় মাসে ৮৭৯৩৭, তৃতীয় মাসে ৮৬১৭৫, চতুর্থ মাসে ৮৪৭২০, পঞ্চম মাসে ৮৩৫৭১, ষষ্ঠ মাসে ৮২,৫২৮ এবং এক বৎসরে ৭৭৫২৮ হয়। পঞ্চম বৎসর বয়সের পূর্ব্বে লক্ষ শিশুর ৩৭৫৫২ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া

৩২,৪৪৮ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ২৫ বৎসর বয়সে ৪৯,৯২৫ অর্থাৎ প্রায় আধ লক্ষ হইয়া যায়। ৫২ বৎসরে তৃতীয়াংশ, ৫৮ বৎসরে চতুর্থাংশ, ৬৭ বৎসরে পঞ্চমাংশ, ৭৮ বৎসরে দশমাংশ, ৮১ বৎসরে বিশাংশ, মাত্র থাকে, ১০০ বৎসরে লক্ষের মধ্যে দশটী জীবিত থাকে।

মনুষ্যের শরীরের বৃদ্ধি যৌবনারম্ভে অর্থাৎ ১৬ বৎসরের পরেই অধিক হইয়া থাকে, ২০ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে শরীরের গঠন একপ্রকার সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত শরীরের বর্দ্ধন ক্রিয়া চলিতে পারে। ৩৮ বৎসর বয়সে কৃশ স্থূল এবং স্থূল কৃশ হইতে পারে। ৪৩ হইতে ৫০ বৎসরের মধ্যে ক্ষুধা মান্দ্য, মুখশ্রীর বিবর্ণতা, গ্রন্থির শিথিলতা, তেজের হ্রাসতা এবং নিদ্রার হানি হইয়া থাকে। দুই এক বৎসর এইরূপ ভাবে গিয়া পুনঃ নূতন বল-সঞ্চার হইয়া ৬০। ৬১ বৎসর পর্য্যন্ত চলে। তৎপরে পূর্ব্বের ক্ষীণতা ও নিস্তেজভাব অধিক পরিমাণে অনুভূত হয়। বার্দ্ধক্য সেই সময়ে আসিয়া শরীরকে অধিকার করে। জরার আগমনে কেশ পলিত, দন্ত গলিত, মাংস লোলিত হয়, অবশেষে কালরূপী মৃত্যু আসিয়া মনুষ্যের ধূলার শরীরকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়।

মনুষ্যের জীবন আলোচনা করিলে তাহা যে কত অনিত্য, স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আমাদিগের বয়সের কত লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, আমরা যে বাঁচিয়া আছি ইহাই আশ্চর্য্য এবং ইহার জন্য জীবনদাতা পরমেশ্বরের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা চিরজীবী হইতে ইচ্ছা করিলেও চিরকাল কখন বাঁচিব না, জন্মিয়াছি, মরিবার জন্য—কোন্ মুহূর্ত্তে মৃত্যু আসিয়া আক্রমণ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। অতএব লক্ষ মনুষ্য সন্তানের মধ্যে ১০ জন যদি ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে, আমি সেই দশজনের একজন হইব, কিরূপে আশা করিতে পারি? এ শরীরকে মৃত্যুর হস্তে অর্পণ করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং জীবন থাকিতে থাকিতে ইহজীবনের কার্য্য যত সাধন করিতে পারি, তাহার জন্য সত্বর ও সচেষ্ট হইতে হইবে, নতুবা মৃত্যু আসিয়া সকল আশায় নিরাশ করিবে।

কিন্তু একটী বিষয় বিবেচনা করিবার আছে; মনুষ্যের শরীর কল

যদিও শত বা দুইশত বৎসরের মধ্যে বিকল ভগ্ন হইয়া যাইবে, এই শরীরের মধ্যে যে আত্মা আছে, তাহা অমর ও চিরজীবী। জ্ঞানে ও ধর্ম্মে এই আত্মাকে যদি আমরা উন্নত করিতে পারি, তাহা হইলে শরীরের বিনাশে দুঃখ কি? আমরা ঈশ্বর কৃপায় অনন্ত জীবনের অধিকারী হইয়া অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিব।

সরোজ।

(১৯৯ সংখ্যা, ১২৪ পৃষ্ঠার পর।)

জননী, যাঁহার ক্রোড়ে শিশু বর্দ্ধিত, যাঁহার স্তন-দুগ্ধ পান করিয়া শিশুর ক্ষীণ দেহ পুষ্টিলাভ করিয়াছে, যাঁহার যত্ন, আদর ও স্নেহে লালিত পালিত হইয়া শিশু দিন দিন সৌন্দর্য্যে বর্দ্ধিত হইয়া গৃহের শোভা সম্পাদন করিতেছে এমন জননী বর্ত্তমানে শিশুকে মাতৃহীন বলা ইহার অর্থ কি? পাঠিকা ভগিনি! বিরক্ত হইবেন না। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁহারা সন্তানের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে বিশেষ ব্যস্ত, কিসে তাহারা সুন্দর দেখাইবে কেবল সেই ভাবনা; মনোহর বেশ ভূষায় তাহাদিগকে সজ্জিত করিতে পারিলেই অনেক জননী আপনাদিগকে ভাগ্যবতী মনে করেন। পরিচ্ছন্নতা, সুরুচি প্রশংসনীয় গুণ, কিন্তু অবিনাশী আত্মার উন্নতিসাধন পক্ষে অন্য উপাদান প্রয়োজনীয়। আহা! আমার বাছার একখানি ভাল কাপড় কি গহনা নাই বলিয়া কত জননী কত সময় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন, কিন্তু সন্তানের আত্মার এই গুণ গুলি নাই একথা কি মনে করিয়া সেরূপ ব্যস্ততা দেখা যায়? শিশু হৃদয়ের নির্দ্দোষ সজীবতা বৃদ্ধি করিতে কয়জন জননী ব্যস্ত? সেই পবিত্র অবিনশ্বর কুসুম কলিকার পূর্ণ-বিকাশ ও মনোহর শোভা বর্দ্ধিত করিতে কয়জন বা উদ্বিগ্ন?

আদরের বালিকা সরোজা কোন্‌সময় একটী ভালকথা শুনিয়াছিল, তাহার শিশু হৃদয়ে হঠাৎ তাহা উদিত হইয়া তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল, সে শিশুসুলভ আগ্রহে বলিয়া উঠিল "আমার খুব ইচ্ছা হয় আবার সেই ভাল কথা গুলি শুনি। মাসিমা কেমন ভাল কথা বলিতেন, তেমন আর কেহ

বলে না। মাকে জিজ্ঞাসা করিলে মা কিছু বলেন না, বরং ধমকাইয়া থাকেন। বাবার কাছে গেলে বাবা বলেন এখন সময় নাই—কাকে জিজ্ঞাসা করি? আহা! এ জগতে আমার দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী কেহ নাই। মাসী মা মরিয়া গিয়া আমি মাতৃহীনা হইয়াছি।

সরোজের মাসী মা সরোজাকে স্বর্গের কথা বলিয়াছিলেন, স্বর্গের দিকে তাহার আত্মাকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ঘরে ঘরে অনেক সরোজা আছেন যাহাদের ক্ষুদ্র হৃদয় উচ্চ বিষয় জানিতে ব্যস্ত হয়, সরল ভাবে মাতার নিকট যায়, হয়ত পিতাকে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু অনেক সময় সহানুভূতি না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া থাকে। যে সকল কথা জানিলে জীবন গঠিত হয়, শিশু হৃদয়ের স্বভাবগত বিশুদ্ধতা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর বর্দ্ধিত হয়, নির্ব্বোধ জননী তৎসম্বন্ধে উদাসীন! মাতা বর্ত্তমানে সন্তান মাতৃহীন কোথায়? যেখানে মাতা সন্তানের আত্মার কুশল চিন্তায় বিরত, তাহার হৃদয় ক্ষেত্রে ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিতে অক্ষম, তাহার নীতিশিক্ষায় অমনোযোগী।

নারী-চরিত।

কৃষ্ণকুমারী।

রাজপুতানার পশ্চিম অংশে মিবর নামে একটী প্রদেশ আছে। উদয়পুর নগর এই প্রদেশের রাজধানী। উদয়পুরাধিপতি সুবিখ্যাত রাণাবংশ অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিল। রাজস্থান রঙ্গভূমিতে এই বংশের অনেক বীর-পুরুষ ও বীর-নারী অদ্ভুত কার্য্যের অভিনয় করিয়াছেন। রাজস্থানের ইতিহাসে ইহাঁদিগের চরিত পাঠে অনেক মৃত হৃদয়ে অগ্নিময় উৎসাহের সঞ্চার হয়।

১৭৭৪ খ্রীঃ অঃ রাণা ভীমসিংহ মিবরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ভীম সিংহ আট বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজ্যাধিকার লাভ করেন। ইহার মাতা ইহাঁকে রাজকার্য্য শিক্ষা দেন। ভীম সিংহ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় সাহসী ছিলেন না, তাঁহার রাজত্ব সময়ে মিবর রাজ্যের অতিশয় দুর্দ্দশা

উপস্থিত হয়। তাঁহার ভীরুতা ও তাঁহার রাজ্যের দুরবস্থা দেখিয়া অন্যান্য দেশীয় রাজগণ প্রবল পরাক্রমে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থান করিল। রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। গৃহ বিবাদে ভারতের সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল। স্বার্থপর রাজগণ আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষোচিত বীরত্ব ও স্বদেশ-হিতৈষিতা বিস্মৃত হইয়া আপনাদিগের স্বার্থ সাধনে রত হইল। সিন্দিয়া, হোলকার ও অন্যান্য ক্ষমতাশালী রাজগণ আসিয়া মিবর আক্রমণ করিল। কে না জানে যে গৃহবিবাদেই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল! যদি জয়চাঁদ ও পৃথী রাজের সহিত কলহ না হইত, তাহা হইলে কি মুসলমানগণ "হো আকবর" বলিয়া পশ্চিম তোরণ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল্লী নগরে প্রবেশ করিতে পারিত?

রাণা ভীম সিংহ নানা প্রকারে বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা একটী অধিকতর ভয়ানক বিপদ তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। রাণা ভীম সিংহের একমাত্র কন্যা কৃষ্ণকুমারী। সম্ভবতঃ কৃষ্ণকুমারী ১৭৯০। ৯১ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণকুমারী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার অমানুষিক সৌন্দর্য্যের কথা ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইল। ভারতে তিনি সেই সময়ে সৌন্দর্য্যে অনুপমা ছিলেন, কেবল সৌন্দর্য্য নয়, তাঁহার ন্যায় একটী বীরবালা ও সদ্গুণসম্পন্ন মহিলা রাজস্থানে সেই সময়ে ছিল কি না সন্দেহ। এই জন্যই লোকে কৃষ্ণ কুমারীকে "রাজস্থান কুসুম" নাম দিয়াছিল। কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্যই তাহার কাল হইল। কৃষ্ণকুমারীর যখন ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময়ে চতুর্দ্দিকের রাজগণ কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণার্থী হইয়া তাঁহার পিতার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। কেবল দূত প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, অনেকে সসৈন্যে সজ্জিত হইয়া উদয়পুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। জয়পুরের রাজা কৃষ্ণকুমারীর পাণি ভিক্ষার্থী হইয়া বরসজ্জায় উদয়পুরের নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। এদিকে কৃষ্ণকুমারীর পিতা সাহাপুরের রাজাকে আপন কন্যা দান করিবার সম্মতি-সূচক পত্র লিখিয়াছেন। মাড়ওয়ার-অধিপতি রাজা মান ভীম সিংহের নিকট তাঁহার দুহিতার পাণিগ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন "যে আপনি আমার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাকে কন্যা দান

করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, আমি তাঁহার উত্তরাধিকারী, সুতরাং আপনার কন্যাকে আমার বিবাহ করিবার অধিকার আছে।” কি চমৎকার যুক্তি! চণ্ডাউত নামে একটী জাতি ছিল, ইহাদের অধিপতি আজিত এই সময়ে মাড়ওয়ার অধিপতির পক্ষ সমর্থন করিলেন। গোয়ালিয়র অধিপতি মহারাজ সিন্ধিয়া এই সময়ে ভারতবর্ষে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার ভয়ে অনেক রাজা সশঙ্কিত ছিল। বস্তুতঃ তৎকালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় পরাক্রান্ত রাজা আর কেহ ছিল না। যৎকালে জয়পুরাধিপতি বিবাহার্থী হইয়া রাণার রাজধানীর নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন, সিন্ধিয়া তাঁহার নিকট কিছু অর্থ চাহিতেছিলেন; কিন্তু জয়পুরাধিপতি জগৎসিংহ অর্থ প্রদানে অস্বীকৃত হইলেন। সুতরাং সিন্ধিয়ার সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। সিন্ধিয়া জয়পুরাধিপতিকে নিরাশ করিবার জন্য মাড়ওয়ারের রাজা মানের সহিত মিলিত হইলেন; এবং রাণা ভীম সিংহকে বলিলেন ‘জয়পুরের রাজা আপনার কন্যার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া আপনার রাজ্যে যে দূত প্রেরণ করিয়াছেন, সেই দূতকে আপনি শীঘ্র বিদায় দিন। রাজা মানের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ স্থির করুন।’ রাণা একজন বিখ্যাত রাজার দূতকে অবমানিত করা অন্যায় মনে করিয়া সিন্ধিয়ার কথায় সম্মতি দিলেন না, খল সিন্ধিয়া তৎক্ষণাৎ আপন সৈন্যসামন্ত লইয়া রাণার রাজধানী আক্রমণ করিলেন। রাণার সৈন্যগণ অধিকক্ষণ সম্মুখ সংগ্রাম করিতে পারিল না, সুতরাং রাণা বাধ্য হইয়া জয়পুরের দূতকে বিদায় দিলেন এবং সিন্ধিয়া যাহা যাহা বলিলেন তাহা করিতে সম্মত হইলেন।

জয়পুরাধিপতি অত্যন্ত অবমানিত ও নিরাশ হইলেন এবং ইহার উপযুক্ত প্রতিহিংসা লইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দী রাজা মানের রাজ্য আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। ইহাদিগের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জয়পুরাধিপতি ১২০০০০ এক লক্ষ বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া রণ-ভূমিতে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরেই মাড়ওয়ার সৈন্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মাড়ওয়ারপতি রাজা মান অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে আত্মহত্যা সাধনে উদ্যত হইলেন। এসময় ভাগ্যক্রমে

তাঁহার কয়েকটী মন্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন এবং তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন। জয়পুর সৈন্যগণ রাজধানী লুণ্ঠন করিল। যোধপুরের অভেদ্য দুর্গে মাড়ওয়ার সৈন্যগণ আশ্রয় গ্রহণ করিল, শত্রুগণ আর অধিক অনিষ্ট সাধন করিতে পারিল না। এই স্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে মাড়ওয়াররাজ রাজা মান কেবল আপনার অসিবলেই সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন এবং যৎকালে জয়পুররাজ জগৎ সিংহের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হইল, মাড়ওয়ারবাসী অনেক সম্ভ্রান্ত লোক রাজা মানকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিবার সংকল্প করিয়াছিল। এই অভিপ্রায়েই তাহারা একদল সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের চেষ্টা সফল হইল না। আমির খাঁ নামক এক জন ভয়ানক দুরাত্মা তাহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, এই নরাধম রাজা মান প্রদত্ত অর্থের লোভে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক আপন পক্ষের বিনাশ সাধন করিয়াছিল। এক দিবস আপন পক্ষীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে এক তাম্বুতে গীত বাদ্য শ্রবণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল। সকলেই আমোদে উন্মত্ত, এমন সময়ে আমির খাঁ কোন ছলনা পূর্ব্বক শিবির হইতে বাহির হইল। তৎক্ষণাৎ তাম্বু ভাঙ্গিয়া পড়িল, হতভাগ্য মাড়ওয়ার বাসীগণ জীবন হারাইল। দুরাচার আমির খাঁর ষড়যন্ত্র এইরূপে সিদ্ধ হইল। রাজস্থানের কয়েকটী সুবিখ্যাত বীর আমির খাঁর চক্রে পড়িয়া বিনষ্ট হইলেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা একটী মহত্তর জীবন বিনাশ ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল। যে কারণে এত যুদ্ধ বিবাদ—রাজ্য ছারখার হইল, রাজধানী লুণ্ঠিত হইল, সেই কারণের অবসান হইল না। কৃষ্ণকুমারীই এই সকল দুর্ঘটনার মূল। তাহার করাভিলাষী রাজাদিগের মধ্যে আর শত্রুতা দূর হইল না। স্বার্থপর কাপুরুষগণ কৃষ্ণকুমারীকে ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে দিবে না, কৃষ্ণকুমারীর পিতা রাণাকেও উপযুক্ত পাত্রে কন্যা দান করিতে দিবে না। আহা! রাজস্থানের কি পরিবর্ত্তন! যে রাজস্থানবাসী রাজগণ ত্যাগস্বীকার, নিস্বার্থতা ও দেশহিতৈষিতার জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন, দেশের হিতের জন্য মৃত্যুকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়াছেন, সেই রাজপুতবংশজ কয়েকটী কাপুরুষ মাংসলোভী সারমেয়ের ন্যায়

একটী স্বদেশীয় রাজাকে জঘন্য স্বার্থ বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিতেছে এবং ভারতের একটী ললনা-ললামকে বলপূর্ব্বক হরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। রাজস্থান, বীরপ্রসূ রাজস্থান, স্বর্ণময় রাজস্থান, ভারত-গৌরব রাজস্থান! তোমার গর্ভে কি প্রকারে এত কাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিল! তোমার বক্ষে এক সময়ে সতীত্বের ধ্বজা উড়াইয়া পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী, তারা প্রভৃতি বীরবালাগণ ক্রীড়া করিয়াছিল। ভীম পরাক্রমশালী ভীম সিংহ, মহা প্রতাপশালী প্রতাপ প্রভৃতি বীর যে রাজস্থান রঙ্গভূমিতে অদ্ভুত বীরত্বের অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই রাজস্থানে কতকগুলি নরাকার পিশাচ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নিষ্কলঙ্ক রাজস্থানকে কলঙ্ক কালিমায় রঞ্জিত করিতেছে।

কৃষ্ণকুমারীর ভবিষ্যৎ যে ভয়ানক অন্ধকারময় তাহা কে জানিত? এক ষড়যন্ত্র দ্বারা আমির খাঁ রাজা মানের বিপক্ষীয়দিগকে বিনষ্ট করিয়াছিল, অন্য একটী দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য রাণার রাজধানী উদয়পুরে আসিয়া উপনীত হইল। কপট পাঠান ছদ্মবেশ ধারণ করিল। তাহার শান্ত প্রকৃতি, বিনয়, সম্মান ও যশের প্রতি নিঃস্পৃহতা, ধর্ম্মোৎসাহ, এই সকল দেখিয়া সকলে তাহাকে সমাদর করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার অন্তরে যে ভয়ানক গরল রহিয়াছে, অন্তর্যামী ব্যতীত আর কে জানিবে? পাঠান আমির খাঁ রাণা ভীম সিংহের নিকট এই কথা বলিলেন যে কৃষ্ণকুমারীকে রাণা মানের করে সমর্পণ করা উচিত, নতুবা কৃষ্ণকুমারীর প্রাণ বিনাশ দ্বারা রাজ্যের শান্তি রক্ষা করা উচিত। এই কয়েকটী কথা দুরাচার পাঠান অতি শান্ত ও বিনীতভাবে বলিল এবং রাণার দৃঢ়প্রত্যয়ের জন্য অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিল। রাণা ভীম ভয়ানক বিপদে পতিত হইলেন। কি করিবেন স্থির করা দুরূহ হইয়া উঠিল। এক দিকে রাজা মানকে কন্যা সম্প্রদান করিলে সম্মানের খর্ব্বতা হয়, অন্য দিকে তাহাকে কন্যা দান না করিলে রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন হয়। অনেক বিবেচনার পর স্থিরীকৃত হইল যে কৃষ্ণকুমারীর বিনাশ সাধনই কর্ত্তব্য, নতুবা শত্রুগণ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া রাজ্য আক্রমণ করিবে এবং তাহা হইলে রাজ্য রক্ষা কঠিন হইয়া উঠিবে। সামান্য রাজ্যের জন্য নিষ্ঠুর পিতা স্বাভাবিক স্নেহ ও দয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার কন্যাকে বলিদান করিবেন স্থির করিলেন।

কার্য্য স্থিরীকৃত হইল, কিন্তু কে সম্পাদন করিবে? এরূপ পাষাণ-হৃদয় কে আছে যে ঐ অলৌকিক কমনীয় সৌন্দর্য্য রাশি দেখিয়া বিমোহিত না হয়? এ স্বর্গীয় রূপ দেখিয়া পাপী আততায়ীরও শরীর কম্পিত হয়, সাধ্য কি আর হস্তোত্তোলন করে? বস্তুতঃ কার্য্যেও তাহাই ঘটিল। প্রথমতঃ একটী স্ত্রীলোককে এই জঘন্য কার্য্য সম্পাদন করিবার অনুমতি করা হইল; কিন্তু সে অস্বীকৃত হইল। মহারাজা দৌলত সিংহ নামে রাণার একজন কুটম্ব ছিলেন, মিবার রাজ্যের ইনি একজন প্রকৃত হিতৈষী। পূর্ব্বোল্লিখিত স্ত্রীলোকটী প্রস্তাবিত কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইলে রাণা দৌলৎকে এই লোমহর্ষণ কার্য্য সম্পাদনের অনুরোধ করিলেন। দৌলৎ রাগে ও ভয়ে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "যে ব্যক্তি এইরূপ ঘৃণাকর কার্য্য করিতে আদেশ করিতে পারে, তাহাকে ধিক্।" অনেক বীর এ দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। অবশেষে মহারাজা জওবান দাস নামক এক ব্যক্তিকে এই কার্য্যের জন্য অনুরোধ করা হইল এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা তাঁহাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। অনেক অনুরোধ ও যুক্তি তর্কের পর জওবানদাস স্বীকৃত হইলেন। পাষাণ-হৃদয় জওবান অস্ত্র লইয়া কৃষ্ণকুমারীকে বধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যখন সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য রাশির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, জওবানের হৃদয় বিগলিত হইল, ভয়ে শোকে বিহ্বল হইলেন, হস্ত হইতে অস্ত্র পতিত হইল, কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিতে গিয়া হত্যাকারী নিজেই মৃতপ্রায় হইয়া ফিরিয়া আসিল। রাণার দুরভিসন্ধি প্রচারিত হইল, কৃষ্ণকুমারীও এই সকল ব্যাপার জানিতে পারিলেন। কিন্তু বীরবালা কৃষ্ণকুমারী কিঞ্চিৎমাত্রও বিচলিত হইলেন না। তাঁহার মৃত্যুতে পিতৃ-রাজ্যের উদ্ধার হইবে, রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইবে এই সকল বিষয় শুনিয়া তিনি আপনার জীবন উৎসর্গে কৃতসংকল্প হইলেন। আপনার জীবন দিলে দেশ রক্ষা পায়, রাজপুত বালার পক্ষে এরূপ মৃত্যু সৌভাগ্য ভিন্ন দুঃখের কারণ নহে। এরূপ মৃত্যুকে রাজপুত বীর বালাগণ সহাস্যমুখে আলিঙ্গন করে। এরূপ অদ্ভুত কার্য্য দ্বারা রাজস্থানের ইতিহাসের প্রতি পত্র অনুরঞ্জিত রহিয়াছে। কৃষ্ণকুমারীও স্বদেশের জন্য জীবন বিসর্জ্জন

করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর জননীর হৃদয়-বিদারক রোদন ধ্বনিতে ও রাজপুরবাসিনী মহিলাদিগের বিলাপে রাজধানী একটী ভয়ানক আকার ধারণ করিল। কৃষ্ণকুমারীর জননী রাণার নিকট কৃষ্ণকুমারীর জীবন ভিক্ষা চাহিলেন; কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। কৃষ্ণকুমারী বুঝিতে পারিলেন যে কেবল তাঁহারই জন্য তাঁহার পিতা চতুর্দ্দিক হইতে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন, এবং তাঁহারই জন্য রাজ্যে এরূপ ভয়ানক অশান্তি,এবং ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার মৃত্যু ব্যতীত আর রাজ্য রক্ষার উপায় নাই। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া কৃষ্ণকুমারী আপন মৃত্যু স্থির করিলেন। এদিকে রাজব্যবস্থায় মৃত্যুর হস্ত হইতে তাঁহার আর রক্ষা নাই, অস্ত্রাঘাত হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন,কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বিষ পাত্র প্রস্তুত হইতেছিল। বিষপাত্র প্রস্তুত হইলে একজন দূত কৃষ্ণকুমারীর নিকট সেই পাত্র লইয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল যে আপনার পিতা ইহা প্রেরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণকুমারী সহাস্য মুখে তাহা পান করিলেন এবং পারলৌকিক সুখ ও শান্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার মাতা এই কথা শ্রবণ করিবা মাত্র উন্মত্তপ্রায় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকুমারীর চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দুও পতিত হইল না, তিনি তাঁহার জননীকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "জননি! আপনি কেন এত শোক প্রকাশ করিতেছেন? আমার জীবনের দুঃখের অবসান হইতে চলিল। আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। আমি তোমার কন্যা হইয়া মৃত্যুকে কেন ভয় করিব? রাজমহিলারা তাহাদিগের ত্যাগ স্বীকারের জন্যই প্রসিদ্ধ"—এইরূপে অবিচলিত ভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন। যে বিষপান করিলেন, তাহাতে তাঁহার জীবন বিনাশ করিতে পারিল না। আর একটী বিষ পাত্র প্রদত্ত হইল, তাহাও নিষ্ফল হইল। কিন্তু দুরাচার পাঠান ও তাহার সহচর আজিব তাহাদের দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য ব্যস্ত ছিল। দ্বিতীয় বার বিষ সেবনেও তাহাদের আশা নিষ্ফল হইল দেখিয়া তৃতীয় পাত্র প্রস্তুত করিল। এই বারে ভয়ানক মারাত্মক বিষ কৃষ্ণকুমারীকে প্রদত্ত হইল। তৃতীয়পাত্র কৃষ্ণকুমারীর হস্তে অর্পিত হইলে তিনি একটু হাসিয়া উহা পান করিলেন।

এই মহা বিষেই তাঁহার জীবন গ্রন্থি ছিন্ন হইল। তিনি নিদ্রাভিভূতা হইলেন, সেই নিদ্রা আর ভগ্ন হইল না। পাপাত্মাদিগের পাপ আশা পূর্ণ হইল। একটী অমূল্য জীবন-কুসুম দুরাশয়দিগের কঠোর করে পেষিত হইল। দুহিতা বিরহ-ব্যথিতা জননী অধিকদিন জীবিত ছিলেন না, শোক তাপে বিহ্বল হইয়া অচিরেই পরলোকে গমন করিলেন, দুহিতার সহিত অনন্তলোকে মিলিত হইলেন।

সহৃদয়া পাঠিকাদিগের সম্মুখে কৃষ্ণকুমারীর একখানি সংক্ষিপ্ত চিত্র স্থাপিত হইল। পাঠিকাগণ দেখিবেন কৃষ্ণকুমারীর সুচরিত্রের কি মনোহারিতা! প্রকৃত দেশহিতৈষিতার নিকট জীবন কি তুচ্ছ পদার্থ! যদি জীবন দিয়া রাজ্যের মঙ্গল হয়, বীরবালা আনন্দের সহিত তাহাতে প্রস্তুত। সেই ভারতবর্ষ এখনও আছে, সেই রাজস্থান এখনও রহিয়াছে। কিন্তু আর সেই রাজস্থান উদ্যানে সেইরূপ মনোহর কুসুম জন্মে না, ভারতের বায়ু আর সেরূপ পরিমল বহন করে না!!

বিষ্ণুপুরের প্রাচীন বিবরণ।

(১৯৯ সংখ্যা, ১০৬ পৃষ্ঠার পর।)

১৮। রাজা জগৎমল্ল—এই রাজা বিষ্ণুপুরীয় ২৭৫ সনে (৯৯০ খৃঃ অব্দে) জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩১৮ শালে (১০৩৩ খৃঃঅব্দে) সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া ৩৩৬ শকে (১০৫১ খৃঃ অব্দে) পরলোক গত হয়েন। বিষ্ণুপুর ইহাঁর রাজধানী ছিল। ইনি গোলন্দ সিংহের দুহিতা চন্দ্রাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাঁর রাজত্বের প্রথমাবস্থায় ইনি রাধা বিনোদ ঠাকুরের উপাসনার্থ এবং রাস মণ্ডপের জন্য দুইটি প্রশস্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। গোপালসিংহ ইহাঁর কামদার ছিলেন। ইহাঁর তিন পুত্র ছিল। কথিত আছে তৎকালে বিষ্ণুপুর ভূমণ্ডলে যাবতীয় রাজ্য অপেক্ষা সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল এবং ইহার অনুপম সৌন্দর্য্য ইন্দ্রের অমরাবতীর শোভাকেও পরিহাস করিত। এই সকল অট্টালিকা বিশুদ্ধ শ্বেত মার্ব্বল প্রস্তরে খচিত এবং ইহার

প্রাচীরের অভ্যন্তর প্রদেশে নাট্যশালা, সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ, এবং বেশ-বিন্যাসোপযোগী প্রশস্ত গৃহ সমুদায় বিরাজিত ছিল। এতদ্ব্যতীত হস্তি-শালা, অশ্বশালা, সৈন্যাবাস, শস্ত্রাগার, কোষাগার, রাজভাণ্ডার এবং একটী দেবালয় ছিল। এই রাজা নগরের সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রভূত যশের অধিকারী হইয়া গিয়াছেন। ইহাঁর রাজত্বকালে একদল বিদেশীয় বণিক্ নগরে বাণিজ্য ব্যবসায় আরম্ভ করে।

৩৩। রাজা রাম মল্ল (ক্ষেত্রনাথ মল্ল ?) এই রাজা ৫৬৪ সনে (১২৭৭ খৃঃ অব্দে) সিংহাসনারোহণ পূর্ব্বক ২৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৫৮৭ সনে (১৩০০ খৃঃ অব্দে) লোকান্তর গমন করেন। নন্দলাল সিংহের কন্যা সুকুমারী বাই ইহাঁর সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ইহাঁর রাজত্বকালে অসংখ্য মুদ্রা ব্যয় করিয়া রাধাকান্ত জিউর (জনৈক বীরের প্রেতাত্মা) নামে একটী দেবালয় উৎসর্গ করা হয়। জগুমন্ধর গুহ ইহাঁর কামদার ছিলেন। এই রাজার চারি পুত্র ছিল। এই সময়ে দুর্গসংস্কার, উহার বিশেষ উন্নতি সাধন এবং নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্র আনীত হইয়াছিল। সৈনিকগণের সুশিক্ষা এবং তাহাদিগের সাম্য সম্পাদনার্থ একজন সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন। সৈন্যেরাও রণবিদ্যায় সমধিক পারদর্শিতা লাভ করে; এমন কি তাহাদিগের সমর-কুশলতার সংবাদ ভীষণাকৃতি আদিম নিবাসীগণের অন্তঃ-করণেও ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। ইহাঁর রাজত্ব সময়ে কোন বৈদেশিক জাতিই বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিতে সাহসী হয়েন নাই।

৪৮। রাজা বিরহাম্বর—ইনি বিষ্ণুপুরীয় ৮৬৮ শকে জন্মগ্রহণ ও ৮৮১ শকে (১৫৯৬ খৃঃ অব্দে) রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন। ইহাঁর চারি স্ত্রী এবং দ্বাবিংশতি পুত্র ছিল। ইহাঁর রাজত্বকাল ২৬ বৎসর; এই সময়ের মধ্যে তিনটী দেবালয় প্রতিষ্ঠাপিত হয়। ইহাঁর রাজত্ব সময়েই দুর্গের শেষ সংস্কার এবং দুর্গপ্রাচীরে কামান সুরক্ষিত হয়। ইনি মুর্শিদাবাদের নবাবের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহার প্রাধান্য বুঝিতে পারিয়া ১,৩১,০০০ টাকা কর প্রদান পূর্ব্বক রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। দুর্গাপ্রাসাদ ঘোর ইহাঁর কামদার ছিলেন।

৫৪। রাজা গোপাল সিংহ—এই রাজা বিষ্ণুপুরীয় ৯১৫ সনে জন্মগ্রহণ

করেন এবং ৩৮ বৎসর রাজত্বের পর ১০৫৫ (১৭০৮ খৃঃ অব্দে) ইহার মৃত্যু হয়। ইনি তুঙ্গভু মেশ্বর রাজা রঘুনাথ তুঙ্গের দুহিতাকে বিবাহ করেন। ইহার রাজত্বকালে পাঁচটী দেবালয় নির্ম্মিত হয়। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ ভাস্কর পণ্ডিতকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করিয়া বিষ্ণুপুর দুর্গের দক্ষিণ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজাও স্বীয় সৈন্যদল সমভিব্যাহারে তাহাদিগের সম্মুখীন হন, কিন্তু বিজয়শ্রী প্রথমতঃ শত্রুপক্ষেরই অঙ্কশায়িনী হইলেন। অবশেষে লোকের বিশ্বাস, মদনমোহন দেবের অনুগ্রহে মনুষ্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া তোপ সমস্ত উদ্গীরিত হইতে লাগিল; ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি নিহত হইলেন এবং বিষ্ণুপুরের সৈন্যগণ শত্রুপক্ষের সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কেহ কেহ বলেন, রাজা স্বীয় পরাক্রমে বহুতর শত্রু নিপাতিত করেন, কিন্তু সেনাপতি রণে অশক্ত, সুতরাং দ্বিতীয় বার যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া দুর্গে পলায়ন করেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ পুনর্ব্বার দুর্গ আক্রমণ করে, কিন্তু প্রাগুক্তরূপে তোপ কর্ত্তৃক প্রতিহত হয়। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচাঁদ বাহাদুরও বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিয়া অত্রত্য রাজাকে পরাজিত করেন, কিন্তু অবশেষে ইহার সহিত মিলিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়েন। এই রাজার দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সিংহাসনাধিরোহণ করেন; কনিষ্ঠ কাঁদির জায়গীর প্রাপ্ত হন। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ অদ্যাপি তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

ইতিহাসে এইরূপ অন্যান্য রাজগণের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। কোন রাজা পুষ্করিণী খনন, বিগ্রহ নির্ম্মাণ এবং দেশীয় প্রচলিত প্রথানুসারে দেবার্চ্চনা করিতেন; কোন রাজা বাণিজ্য বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতেন; কেহ বা সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রই সর্ব্বত্র পিতৃ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতেন; কনিষ্ঠেরা উপযুক্ত বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতেন। বিষ্ণুপুর রাজবংশ, মুসলমান নবাবদিগের কখনও শত্রু, কখনও মিত্র, কখনও বা করদ হইয়াছিল। কিন্তু ইহারা তৎকালীন ইংরাজদিগের ন্যায় চিরকাল মুর্শিদাবাদের রাজ দরবারে প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্ব্বক স্বকীয় উপস্থিতি হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেন। কথিত আছে, কতিপয় রাজা বাণিজ্যের উৎসাহ সংবর্দ্ধন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের রাজত্বকালে বৈদেশিকেরা রাজধানীতে

উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল। জনৈক রাজা, দুর্গের জীর্ণ সংস্কার এবং দুইটী বিচারপতি নিযুক্ত করেন। এই রাজগণের পঞ্চাশৎ পুরুষ পরে (বিষ্ণুপুরীয় ৯২২ এবং খ্রীষ্টীয় ১৬৩৭ অব্দে) ইহাঁরা মল্ল উপাধি (দেশীয় পূর্ব্বতন শক্তির অন্যতম চিহ্ন) পরিত্যাগ করেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই রাজবংশ পতনোন্মুখ হয়। মহারাষ্ট্রীয়গণ ইহাঁদিগের সর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠন করে। ১৭৭০ সনের দুর্ভিক্ষের করাল কবলে জনসংখ্যা হ্রাস হইয়া যায় এবং ইংরাজগণ এই করদ রাজগণের প্রতি সামান্য জমিদারের ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে হীন করিয়া ফেলেন।

প্রাগুক্ত পণ্ডিত এইরূপে তাঁহার বিবরণের উপসংহার করিয়াছেন :— মদনমোহনের বিগ্রহ বিষ্ণুপুর হইতে স্থানান্তরিত হইলে এই রাজ্যের ধ্বংস হইতে আরম্ভ হয়। রাজা স্বকীয় দারিদ্র্য নিবন্ধন কলিকাতার গোকুলচন্দ্র মিত্রের নিকট উক্ত বিগ্রহ বন্ধক রাখেন। কিয়ৎকাল পরে এই হতভাগ্য রাজা অশেষ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক উহাকে মুক্ত করিবার উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় মন্ত্রীকে উক্ত বন্ধকী বিগ্রহ আনয়নের নিমিত্ত কলিকাতায় প্রেরণ করেন। গোকুল, টাকা প্রাপ্ত হইল, কিন্তু বিগ্রহ প্রত্যর্পণে অস্বীকার করিল। অবশেষে কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টে মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়া রাজার পক্ষেই বিচার নিষ্পত্তি হইল। কিন্তু গোকুল, মূল বিগ্রহ না দিয়া তাহার অবিকল প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করাইয়া রাজাকে প্রদান করিল।

বিষ্ণুপুর নগর এবং ইহার প্রধান প্রধান বাটীর নিম্নলিখিত বিবরণ, কর্ণেল গেষ্টাবেলের রেবিনিউ সারভে রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত হইল :—

স্থানীয় পরম্পরাগত শ্রুতিবাদ অনুসারে এই রাজ্য খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আদিমল্ল কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছিল। কথিত আছে, ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে আদিমল্লের বংশোদ্ভব রাজা বরসিংহ স্বকীয় সৌর্জন্য, বদান্যতা, সরোবর নির্ম্মাণ, প্রভৃতি সুমহৎ গুণ ও কার্য্যে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ও প্রথিতনামা হইয়াছিলেন। তিনি বহুতর দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে চৈতন সিংহ নামক রাজাও তদ্রূপ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত জঙ্গল মহলের (বাঁকুড়ার পূর্ব্বতন

নাম) দণশালা বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরকালীন বংশধরগণ অপব্যয় করিয়া ধনসম্পত্তি নিঃশেষ করিয়াছিল, এবং অবশেষে রাজস্বের ঋণের জন্য সমস্ত সম্পত্তি গবর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হইয়া গেল।

কর্ণেল গেষ্টারেল বলেন, একদা বিষ্ণুপুর সাত মাইল দীর্ঘ প্রাচীর, উচ্চ বুরুজ এবং পরিখা পরিবেষ্টিত ছিল। বহিঃস্থ প্রাচীরের অভ্যন্তর প্রদেশে এবং নগরের পশ্চিমাংশে দুর্গ অবস্থিত ছিল। এক্ষণে ঐ সকল দুর্গের কতিপয় ভগ্নাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। দুর্গের অভ্যন্তর প্রদেশে রাজভবন স্থাপিত ছিল। রাজ্যের সমৃদ্ধিসময়ে ইহার কীদৃশী অবস্থা ছিল, বর্ণনা করা সুকঠিন। বর্ত্তমান সময়ে রাশি রাশি ইষ্টক প্রাচীন প্রাসাদনিচয়ের ভগ্নাবশেষ চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাচীন প্রাঙ্গণের প্রাচীরসমূহ এক্ষণে প্রায় ভূমিশায়ী হইয়া গিয়াছে এবং যে সকল তোরণ দ্বার এক সময়ে অতীব দৃঢ়রূপে সন্নিবেশিত ছিল, এক্ষণে তাহা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়া গিয়াছে। দুর্গের অভ্যন্তরে এবং বর্ত্তমান নগরীর উত্তর পার্শ্বে প্রাচীন দেবালয় পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান আছে। দুর্গাভ্যন্তরস্থ গৃহগুলি এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় জঙ্গলাবৃত হইয়া রহিয়াছে। গড়ের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের বহির্দ্দেশে কিঞ্চিৎ দক্ষিণস্থটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালীতে বিনির্ম্মিত। উহার ভিত্তিদেশ দীর্ঘ প্রস্থে ১০০ এবং উচ্চে প্রায় ৭ ফিট হইবে এবং উহা সমচতুষ্কোণ সুদৃঢ় প্রস্তর খণ্ডে বিনির্ম্মিত। উহার ৯।১০ ফিট উচ্চে তিন শ্রেণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খিলান সংযুক্ত স্তম্ভ উর্দ্ধদেশে বিরাজমান ছিল। এই সকল স্তম্ভের মধ্যে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ অন্ধ প্রকোষ্ঠ ছিল। এই সকল খিলান এবং স্তম্ভ সমস্তই ইষ্টক নির্ম্মিত। বহিঃস্থ স্তম্ভশ্রেণীর হিন্দুস্থপতি চিন্তানুরূপ শূকর পৃষ্ঠাকৃতি গুম্বজবৎ ছাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট গুলির পিরামিডের ন্যায় সূক্ষ্ম অগ্রভাগ ছিল। এই সমস্ত দেবালয় একত্র গ্রথিত এবং ইহার সকল গুলিতে একরূপ চূনকাম করা ছিল। এই সকল মন্দিরে প্রবেশের একমাত্র প্রস্তর নির্ম্মিত অপ্রশস্ত দ্বার ছিল। অধিকাংশ দেবালয়ই উৎকৃষ্ট ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাহাতে নানাবিধ পশু পক্ষী ও অন্যান্য

অত্যুৎকৃষ্ট প্রতিমূর্ত্তি সকল অঙ্কিত ছিল। ঐ সকল এমন সুসজ্জিত হইয়াছিল, যে তাহা সকলের আদর্শস্থানীয় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে। কতকগুলি সমচতুষ্কোণ দেবালয়ের চতুর্দ্দিকস্থ চূড়ার প্রারম্ভ হইতে যে সকল গুম্বজ উত্থিত হইয়াছে, তাহা এবং ঐ সকল চূড়া একবিধ প্রণালীতে নির্ম্মিত নহে।

দুর্গের দক্ষিণ দ্বার সমীপে ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর বিশিষ্ট দ্বারবিরহিত একটী অদ্ভুত গৃহ দৃষ্টিগোচর হয়। এই গৃহের উপরিভাগে ছাদ নাই। প্রবাদ আছে, অপরাধী ব্যক্তিগণকে তথায় নিক্ষেপ করিয়া অনাহারে প্রাণদণ্ড করা হইত। কথিত আছে, উহার নিম্নভাগ লৌহ শলাকাদ্বারা কণ্টকিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহার কোন চিহ্ন বিদ্যমান নাই। আজিও দক্ষিণদ্বার সমীপে ভূরি ভূরি শস্যাগারের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। অদ্যাপি দুর্গের অভ্যন্তর প্রদেশে জঙ্গল মধ্যে একটী সুবৃহৎ কামান নিপতিত রহিয়াছে। বাহ্যদৃষ্টে উহা ৬৪টী লৌহচক্রের সংযোগে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয় এবং আজিও ঐ সকল চক্রের একত্র গ্রন্থনের চিহ্ন সমুদয় সুস্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়। উহা দৈর্ঘ্যে ১২ ফিট ৫॥ ইঞ্চি, উহার নলের মুখাগ্রভাগের ব্যাস ১১॥ ইঞ্চি এবং অবশিষ্ট ভাগের ব্যাস ১১॥ ইঞ্চি পরিমিত। কিংবদন্তী আছে যে, এইটি এবং ঈদৃশ আর একটি কামান, কোন দেবতা বিষ্ণুপুরের জনৈক প্রাচীন রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, অপর কামানটী কোন হ্রদের তলায় অবস্থিত আছে। এইটি যদিও সর্ব্বদাই অনাবৃত থাকে, তথাপি সম্পূর্ণরূপে মরিচা হইতে বিনির্ম্মুক্ত এবং মার্জ্জিত অবস্থায় রহিয়াছে।

এই নগরের সীমান্তর্ব্বর্ত্তী স্থানের মধ্যে ৭টী বাজার, একটি ডাকঘর, একটি বিচারালয়, একটি থানা, এবং একটি গবর্ণমেণ্ট ও কতকগুলি অন্যদীয় বিদ্যালয় আছে। এখানে অসংখ্য মুসলমান মসজিদ বিশেষতঃ অসংখ্য হিন্দু দেবালয় বর্ত্তমান আছে। ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে এক্ষণে এত অধিক সংখ্যক সমৃদ্ধিশালী লোক অবস্থান করিলেও নগরে ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ অতি বিরল দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেকে বলেন, ভূতপূর্ব্ব রাজগণের অবৈধ অত্যাচারই ইহার প্রধান কারণ, যেহেতু ধন সম্পত্তির চিহ্ন প্রদর্শিত হইলেই তাহার প্রতি ভয়ানক দৌরাত্ম্য হইত। এমত অবস্থায়

ইষ্টক এবং চুন হইতে তৃণ ও পত্র অনেকাংশে নিরাপদ। কিন্তু যদিও উল্লিখিত কারণ বহুদিন অন্তর্হিত হইয়াছে, তথাপি সন্তানগন আজিও তাহাদিগের পিতৃগণেরই পদানুসরণ করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের আড়ম্বর বিহীন বাসস্থানেই থাকিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল যাইবার সৈনিকদিগের প্রাচীন প্রশস্ত বর্ত্ম বিষ্ণুপুর নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং তথা হইতে উহার অন্য এক শাখা দক্ষিণ দিকে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

আইসলণ্ড দ্বীপের গয়সর।

পৃথিবীতে যত উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তন্মধ্যে আইসলণ্ড দ্বীপের গয়সর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। দেশীয় ভাষায় গয়সর অর্থ বিদারণ। প্রবল তেজে ভূমি বিদারণ করিয়া এই প্রস্রবণ সকল উত্থিত হইয়াছে, এই জন্য ইহারা এইরূপ নামে অভিহিত। আইসলণ্ড দ্বীপে নানা স্থানে বহুসংখ্যক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তন্মধ্যে দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগে উপত্যকা ভূমিতে প্রধান প্রস্রবণ গুলি দৃষ্ট হয়। ইহারা হেকলা নামক আগ্নেয়গিরি হইতে প্রায় ৩৬ মাইল দূরস্থ। এই স্থানে এক ক্রোশের মধ্যে শতাধিক প্রস্রবণ আছে, তাহাদের কতকগুলির জল অনবরত ফুটিতেছে, কিন্তু তাহা হইতে কোন পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হইতেছে না, অন্য গুলি হইতে ফোয়ারার ন্যায় জল উচ্চ হইয়া আকাশে উঠিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, তাহাদিগের নাম মহাগয়সর ও নবগয়সর। তাহাদিগের হইতে যে বাষ্প স্তম্ভ উত্থিত হয়, পথিকগণ তাহা অনেক দুর হইতে দেখিতে পান। হেণ্ডারসন্ সাহেব বলেন পর্ব্বতের পাদদেশ অতিক্রম করিয়াই এত বাষ্প রাশি আকাশ মার্গে উঠিতেছে দেখিলাম, যে তদ্দারা সেই স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণের অস্তিত্ব অনায়াসে অনুমান করিতে পারিলাম।" গয়সরদ্বয় হইতে জল অবিরত উত্থিত হয় না, মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। মহাগয়সর যখন স্থির থাকে, তখন ইহা দেখিতে বৃহৎ গোলাকার মৃত্তিকার স্তূপ স্বরূপ, মৃত্তিকার স্তূপের উপর উঠিলে নিম্নে একটি কুণ্ড দৃষ্ট হয়, তাহার

আইসলণ্ড দ্বীপের গয়সর।

কতক অংশ কাচবৎ স্বচ্ছ উষ্ণ জলে পরিপূর্ণ, তাহাতে বুদ বুদ সকল উত্থিত হইতেছে। এই কুণ্ডের মধ্যস্থলে ৮০ ফিট গভীর এবং ২৪।২৫ ফিট পরিধিবিশিষ্ট একটী গহ্বর বা কূপ। কলুদিগের তৈল ঢালিবার কাঁপার ন্যায় ইহা উপরিভাগে প্রশস্ত, নিম্নে ক্রমশ সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কুণ্ডটী জলে পরিপূর্ণ থাকিলে তাহার বেড় ১০৫ ফিট এবং গভীরতা ৪ ফিট মাত্র। জল কখন কখন মৃত্তিকাস্তূপ ছাপাইয়া বাহিরে প্রবাহিত হয়, তাহাতে চতুর্দ্দিকস্থ শৈবাল, ঘাস প্রভৃতি প্রস্তর বালুকাতে আবৃত হয়, কখন কখন আশ্চর্য্যরূপে প্রস্তরীভূত হইয়া যায়। গয়সরের নিদ্রিত অবস্থার দৃশ্য এইরূপ। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ইহা যখন জাগ্রত হয়, তখন আর এক প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করে। কামান শব্দের ন্যায় ভূগর্ভমধ্যে ঘন ঘন ভয়ঙ্কর ধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। তাহাতে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, নিকটস্থ অধিবাসীরা অগ্ন্যুৎপাতভয়ে দূরে পলায়ন করে। তখন কুণ্ডস্থ জল ক্রমশঃ অধিকতর আন্দোলিত হয়, টগ বগ করিয়া ভয়ঙ্কর ভাবে ফুটিতে থাকে এবং ধারার আকারে আকাশ-পথে উত্থিত হয়। প্রথম ধারা সকল সূক্ষ্ম থাকে, ক্রমে তেজস্বী হয় এবং মধ্যস্থল হইতে দৈত্যের আকারে এক বৃহৎ জল স্তম্ভ আকাশের উচ্চদেশ স্পর্শ করিয়া থাকে। ইহা দেখিলে অন্তর যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে বাষ্প উত্থিত হইয়া বায়ুমণ্ডলকে পূর্ণ করে, তাহার মধ্য দিয়া জলস্তম্ভ সকল ফেণা উদ্গীরণ করিতে করিতে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয় এই সময়ে উৎক্ষিপ্ত ও নিপতিত জলকণাতে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া যে অত্যাশ্চর্য্য মনোহর বর্ণ সকল উৎপাদন করে, তাহা দেখিলে মোহিত হইতে হয়। নিম্নে উজ্জ্বল নীল, হরিৎ, প্রভৃতি বর্ণ, উর্দ্ধদেশে সুবিমল শুভ্রবর্ণ যেন অপরূপভাবে খেলিতে থাকে এবং উৎকৃষ্ট তুপড়ী বাজীর সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতে থাকে। গয়সরের জলধারা সকল সময় সমান তেজে ও সমান উচ্চ হইয়া উঠে না। ভ্রমণকারী ওলাক সেন ও পবেল সেন ৩৬০ ফিট, ১৭৭২ সালে ভন ট্রয়ল ৯২, ১৭৮৯ সালে সার জন ষ্টানলী ৯৬, ১৮০৪ সালে দিনামার সেনাপতি ওলসেন ২১২, ১৮০৯ সালে হুকার শতাধিক এবং ১৮১০ সালে সার জর্জ মেকেঞ্জী ৯০ ফিট পর্য্যন্ত উঠিতে দেখিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

বাণী।

ভবে এসে দুরাশার কুহকে পড়িয়া
বিপত্তি বিষম গিরি লঙ্ঘনে অপার,
ক্লান্ত প্রাণ শ্রান্ত কায়, শ্লথ গ্রন্থি সমুদায়,
হৃদয় বিশুষ্ক হায়!—মরুর আকার!
এইবার মরিলাম, সব শূন্যময়,
'মরিবে না' কে আমায় বলে এ সময়? ১

ঐ যে আসীনা বাণী, সতী কণ্ঠাসনে;
আশ্বাসের স্নিগ্ধ নীর কে সিঞ্চিবে আর
নিরাশের চিত্তোদ্যানে; ইনি বিনা, মর প্রাণে
অমর সুখের আশা কে করে সঞ্চার?
বল দেবি! কি কৌশলে মধুর বচন
আলাপি, হরিলে তুমি মম প্রাণ মন! ২

বসন্তে কানন মাঝে কোকিলার তান,
কুসুমিত লতা বনে মধুর কূজন,
নির্ঝর কমলপরে, কত অলি গান করে,
কত দিন কত স্থানে করেছি শ্রবণ;
কিন্তু দেখি নৈসর্গিক চারু স্বর যত,
ও মিষ্ট বচন কাছে হ'ল পরাহত। ৩

পারিবে কি কভু নর, কারু বিদ্যাবলে,
ওই কণ্ঠসম যন্ত্র করিতে সৃজন?
শুনে যার তান লয়, দুঃখে হবে সুখোদয়,
শোকীর হৃদয় ব্যথা হইবে মোচন?
বামাকণ্ঠে তুমি বাণী বিধাতার বীণা,
মোহন মুরলীসহ তোমার তুলনা। ৪

কিন্তু এই খেদ দেবি!—তব দিব্য ভাব,
সকল রমণী কণ্ঠে প্রকাশ না হয়;

মৃদু মন্দ সমীরণ, সকলেরি হরে মন;
কিন্তু কুষ্ঠ-রোগি দেহ শব গন্ধময়,
পরশিয়া করে তার স্বভাব আবিল,
বমন কারণ হয় মধুর অনিল। ৫

তুমি বাণী সুরপুর মলয় সমান,
আলাপ সুরভি গুণে হর সর্ব্ব মন;
যে নারী হৃদয় ঘরে, দয়া ক্ষমা না বিহরে,
দ্বেষ রাগে করে যার অন্তর শোষণ,
তার মুখে কি দুর্গতি!—তুমি বিষময়,
ফণিমুখে হয় কবে অমৃত উদয়? ৬

কিন্তু ধন্য দয়াবতী,—কুসুম সমান
যাহার হৃদয় কম, বিনয় প্রতিমা,
সার্থক রসনা তার, ঢালয়ে সুধার ধার,
শুনি জগজন গায় তোমার মহিমা;
কর তবে সতীকণ্ঠে নিত্য প্রেমালাপ,
কর্কশ-ভাষিণী শুনে করুক বিলাপ। ৭

বাজাও বাজাও সতি! বীণা সপ্তস্বরা,
ক্ষরে যাহে পুণ্য সুধা, মোহে দেবচিত,
ভুলুক নারকী পাপ, হোক তার অনুতাপ;
বিষয়ীর বজ্রহৃদি হোক্ বিগলিত,
সরল মধুর বাণী শুনিয়া তোমার,
বিভু প্রেমে মত্ত হোক্ অখিল সংসার॥ ৮

সীতা উদ্ধারে কাট বিড়ালরে সেতু বন্ধন।

রাম পঞ্চবটী বনে বসতি করিতেছেন। কৈকেয়ীর শঠতাজালে তিনি সিংহাসনচ্যুত হইয়া বনবাসী হইয়াছেন। দণ্ডিত অপরাধীর ন্যায় লোকালয়